বসন্ত-প্রয়াণ।

শ্রীসরযূবালা দাস গুপ্তা প্রণীত।

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত)

কলিকাতা, কলেজস্কোয়ার উইলকিন্স প্রেসে
জে, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা।

পাঠকের কাছে এই গ্রন্থখানির পরিচয় করাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি এমন ভার লইতাম না। কারণ আমি জানি কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ কাজটি করিলেই ইহার অনুরূপ কাজের জন্য অন্তত অনুরোধ সহিতে হইবে। আমার বয়সে নিত্য প্রয়োজনের পক্ষেই শক্তির টানাটানি ঘটে, এই জন্য কাজ যাহাতে না বাড়ে সেজন্য সাবধান হইতেই হয়।

কিন্তু সাবধানী মানুষের সংকল্প স্থির থাকে না এমন ঘটনাও ঘটে। বইখানি পড়িয়া আমারও সেই দশা হইয়াছে। যখন ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার অনুরোধ পাই-

লাম, তখন ভাবী বিপদের আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়াও সম্মত হইতে দ্বিধা করিলাম না।

পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই ক্রমে ক্রমে আপনার পরিচয় আপনিই দিয়া থাকেন। তাঁহাদের রচনা অল্পে অল্পে অঙ্কুর হইতে বাড়িয়া ক্রমে ক্রমে শাখা পল্লবে সম্পূর্ণরূপ ধারণ করে—ইতিমধ্যে পাঠকেরা রহিয়া বসিয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইবার অবকাশ পায়। এই জন্য অল্প বয়সের কোনো লেখকের প্রথম রচনা দেখিবার জন্য যখন অনুরোধ পাওয়া যায়, তখন তাহা পড়িতে ভয় করি। মনে জানি, এরূপ লেখা কাঁচা হইবারই কথা। কারণ যদি বা কোনো গুণী, বিধাতাদত্ত বীণা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন তবু সেটার সুর বাঁধিতে এবং তাহাকে আয়ত্ত করিয়া লইতে, অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ

তাহা না ঘটে ততক্ষণ তাঁহার শক্তি অনাথ হইয়া থাকে। কেননা বাহিরের নৈপুণ্য কেবল যে অন্তরের শক্তিকে প্রকাশ মাত্র করে তাহা নহে, তাহাকে জাগাইয়া তুলিতে থাকে।

খাতাখানি হাতে লইয়া পড়িতে বসিলাম। অক্ষরগুলি কাঁচা মেয়েলি ছাঁদের। জানিনা তাহা লেখিকার নিজের কিনা। কিন্তু অধিকাংশ মেয়ের হাতের অক্ষরের ছাঁদ কেন যে অনেকটা এক রকমের হইবে, তাহাত বুঝিতে পারি না। তাহার কারণ যাহাই থাক, তাহার ফলে, এই হয়, মেয়ের হাতের লেখা পড়িবার সময় প্রথমেই ধারণা হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণতা নাই। মনে হয় যিনি লিখিতেছেন, নিজের ছাঁদে জোর করিয়া চলিবার সাহস তাঁহার নাই। দস্তুর মানিয়া, দশের মুখ চাহিয়া, অন্তঃপুরের গণ্ডী বাঁচাইয়া

কতকগুলি প্রচলিত কথাকে মেয়েলি পোষাকে কনে বউ সাজাইয়া, অত্যন্ত জড়সড় ভাল মানুষ করিয়া বসানো হইয়াছে, ইহারা বিশ্ব ভুবনের নহে, ইহারা ঘরের কোণের সামগ্রী মাত্র।

মনে সেই আশঙ্কা করিয়াই পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম পড়িতে পড়িতে মন নম্র হইয়া আসিল। বিচারকের আসন হইতে নীচে নামিয়া বসিতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ রহিল না, যে, এ একটা নূতন সৃষ্টি বটে। এ ত একেবারেই শেখা কথা নহে। প্রথমে একটা পেন্সিল হাতে করিয়া বসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম যেখানে ভাষা বা ভাব কাঁচা আছে দাগ দিব, কিম্বা কিছু কিছু বদল করিব। পেন্সিল রাখিয়া দিলাম—কোথাও কিছু দাগ দিই নাই।

এই রচনার মধ্যে কোথাও যে কিছু বদল করিলে চলে না এমনতর কথা নয়। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রতি মনের উৎসাহ রহিল না। তাহার একটা কারণ এই যে, সমস্ত জিনিষটা যেখানে সাঁচ্চা, সেখানে স্থানে স্থানে দাগে আঁচড়ে বিশেষ কিছু আসে যায় না—গিল্টিতে আঁচড় লাগিলেই ভয় হয় তাহার ফাঁকি ধরা পড়িবে। আর একটী কারণ এই, যে রচনা প্রাণের সৃষ্টি প্রাণময়, বাহির হইতে তাহাকে বদল করা সহজ নহে ; তাহার সমস্ত ত্রুটিও তাহার বিকাশের অঙ্গ। ইঁট কাট সাজাইয়া যাহা তৈরি, তাহাকে ভাঙিয়া চুরিয়া মেরামৎ করা যায় কিন্তু জীবকে ত মেরামৎ করা চলে না।

এ কথা শুনিতে অদ্ভুত কিন্তু ইহা সত্য যে অন্যের নকল করা সহজ কিন্তু নিজের

সত্যটিকে অবারিত করা সকলের চেয়ে কঠিন। কারণ আমরা প্রত্যেকেই দশের দ্বারা অত্যন্ত চাপা পড়িয়া গেছি। সেই দশের ভিড় ঠেলিয়া নিজেকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা আমাদের শক্তিতে নাই। হাটের কোলাহলের উপরে নিজের সুরটিকে জাগাইয়া তুলিতে পারি না বলিয়া গোলে হরিবোল দিই;—সেইটেই সহজ, এবং আশপাশের লোকেও সেইটে প্রত্যাশা করে।

কিন্তু এই "বসন্ত-প্রয়াণ" একেবারে আপনার সুরে আপনি প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের সাহিত্যে কিম্বা অন্য কোনো সাহিত্যে অন্য কোনো বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে লেখক নিজের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করিয়াছেন—তাহার কোনোটার সঙ্গে এই রচনাকে ঠিক মিলাইতে পারি না। সেই গ্রন্থগুলি "Confession" নামে পরিচিত—এই নামের দ্বারাই বোঝা যায় ওগুলি পাঠকদের সম্মুখে রাখিয়াই লেখা—কোনটা বা কৈফিয়ৎ, কোনোটা বা অন্যের কাছে নিজের পরিচয় দান।

বসন্ত-প্রয়াণও লেখিকার নিজের জীবনের একটা পরিচয় বটে কিন্তু সে পরিচয় পরের কাছে নহে। সে পরিচয় স্বতই প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থাৎ ইহা রাঁধা তরকারী নহে ইহা গাছের ফল। বাহিরের রৌদ্র বৃষ্টি বাতাসের সঙ্গে গাছের জীবনীশক্তির যোগ হইয়া ফলটি গাছকে সার্থক করে;—অন্যের দিকে তাকাইয়া এ ফল তৈরি হয় না, কিন্তু অন্যে ইহাকে ভোগ

করিতে পারে। বসন্ত-প্রয়াণকেও পাঠকেরা তেমনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিবে কিন্তু পাঠকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহা লেখা হয় নাই। আপনাকে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য, পাঠকেরা উপলক্ষ্য। অর্থাৎ এ বইখানি কাব্য।

কিন্তু কাব্য বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি বসন্ত-প্রয়াণ তাহা নহে। ইহার মধ্যে রসের অংশ যেমন, তত্ত্বের অংশও তেমনিই—কোনোটা কম নহে। পৃথিবীর বয়ঃসন্ধির সময়ে, যখন তাহার অন্তরে অন্তরে একটা প্রবল উত্তাপের বিপ্লব ঘটিতেছিল তখন যেমন নানা বিভিন্ন পদার্থ গলিয়া মিলিয়া কত যৌগিক ধাতুর স্তর রচনা করিয়াছে, এই রচনাটী সেই রকমের। অন্তরের আগুনে গদ্যে পদ্যে মিলিয়া এক হইয়া

গেছে—এখন তাহাদিগকে পৃথক করা দায়। স্বামীর দুঃসহ বিচ্ছেদ তাপে এই রচনার মধ্যে যেন স্ত্রী পুরুষের যুগল প্রকৃতি অবিচ্ছেদে একাত্ম হইয়া দেখা দিয়াছে।

"স তপোঽতপ্যত"। তাপইত সমস্ত সৃষ্টির গোড়ায় আছে। এই লেখাটিও যেন লেখিকার জ্বলন্ত হৃদয়ের তাপে আবর্ত্তিত হইতে হইতে ছিন্ন হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরাও যেন একটী সদ্য সৃষ্টির অপূর্ব্ব রহস্যটিকে তাহার নিজের আলোকে প্রত্যক্ষ করিলাম।

জ্যোতির্ব্বিৎ রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া দূরবীণ লইয়া নক্ষত্রের তালিকা করিতেছেন। একদিন দেখিলেন যেখানে প্রায় কিছুই দেখা যাইতেছিল না সেখানে একটি তারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলতা প্রথম

শ্রেণীর তারার সমান। তিনি বুঝিলেন হয়ত দুই তারার প্রবল সংঘাতে এই একটি নূতন জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা যে সাহিত্য জ্যোতিষ্কটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি ইহার কোনো জ্যোতির রেখাত ইহার পূর্ব্বে কোন দিক্‌প্রান্তে দেখা যায় নাই। তাই স্পষ্টই দেখিতেছি ইহার মধ্যে সৃষ্টির একটি আদি রহস্য রহিয়াছে।

হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ে প্রেমের সংঘাত যেখানে ঘটে সেখানে চৈতন্য উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। সেই উদ্দীপ্ত বোধের আলোকে সীমার সঙ্গে অসীমের যোগরহস্যটি যেন প্রত্যক্ষ হইয়া প্রকাশ পায়। যাহাকে ভাল-বাসি তাহার সীমার মায়া যেন কাটিয়া যায়, তাই তাহার মূল্য অসীম হইয়া উঠে, তাই তাহার জন্য প্রাণ দেওয়া কঠিন হয় না।

অসীমকে আর কোন উপায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পাই না—তাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়াই দেখি আর মন দিয়াই দেখি, সীমার পর্দ্দা পড়িয়া যায়; একটা পর্দ্দা উঠাইলে তাহার পরে আর একটা পর্দ্দা দেখা দেয়। এই জন্যই তো উপনিষদে বলে, বাক্য এবং মন তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই ফিরিয়া আসার কথাই যদি একেবারে শেষ কথা হইত তবেত অনন্তের সঙ্গে কোনো কারবারই কোনমতে চলিত না।

তাই উপনিষদে বলে তিনি ধরা পড়িয়াছেন আনন্দে—অর্থাৎ প্রেমে। প্রীতির মধ্যে আমরা অনন্তকে একেবারে অন্তরতম করিয়া উপলব্ধি করি। সেখানে কোনো পর্দ্দা নাই। সেখানে একপিঠে দেখি সীমা অন্য পিঠে দেখি অসীম। সেখানে চোখে

যদি দেখি রূপ, ভাবের মধ্যে দেখি রস ; সেই রূপকে খণ্ড করা যায় কিন্তু রসকে খণ্ড করা যায় না। এই রসের স্বাদটি ঠিকমত পাইলে মানুষ তাহার জন্য না করিতে পারে এমন কিছুই নাই। কেননা সেইখানে সে যে অল্প কিছুকে পাইল না, সে ভূমাকে পাইল, এমন কিছুকে পাইল, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ"।

এই আনন্দটি আমরা জলে স্থলে আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে কিছু না কিছু পাইতেছিই। তাহাতেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে অপরূপের পরিচয় ধরা পড়িতেছে ; তাহাতে বুঝিতেছি, "রসো বৈ সঃ," অর্থাৎ বুঝিতেছি বস্তুতে কেবল বস্তুরই প্রকাশ নহে, তাহাতে একটি অখণ্ড রসের লীলা আছে ; বীণার খণ্ড তারটিতে অখণ্ড সঙ্গীতের আনন্দ

স্পন্দিত হইতেছে। সেই খণ্ড তারটির দ্বারা সেই আনন্দের পরিমাপ হইতে পারে না। এই আনন্দ হইতেই আমরা জানিতেছি যাহা কিছু নির্ব্বচনীয় তাহারই সঙ্গে মিলিয়া আছে অনির্ব্বচনীয়।

শুধু তাহাই নহে। যাহা নির্ব্বচনীয়, যাহা সীমাবদ্ধ তাহা সেই সীমার আড়ালে আমাদের বাহিরে পড়িয়া থাকে। সেই সীমাই তাহাকে আমাদের সঙ্গে মিলিতে দেয় না। বীণার তারটাকে কোন মতেই আমি আত্মসাৎ করিতে পারি না। কিন্তু যাহা অনির্ব্বচনীয় সেই সঙ্গীতের রসটি একেবারে অব্যবহিত হইয়া আমার সঙ্গে মিলিয়া যায় আমাতে তাহাতে ভেদ থাকে না। আনন্দের দ্বারা অসীমকে একেবারে আপন করিয়া পাই।

নরনারীর প্রেমে এই আনন্দের আলোটি একান্ত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। এই আলোকে অসীমের আনন্দরূপের যেন মহোৎসব ঘটে। জলে স্থলে আকাশে যে আনন্দের বিচিত্র আভাস আমরা পাই তাহাকে পরিপূর্ণরূপে পাই না, কিন্তু যুগল প্রেমের প্লাবনে মানুষের শরীর মন, ধ্যান জ্ঞান, দান গ্রহণ সমস্তই সর্ব্বাংশে আনন্দময় হইয়া উঠে। একজন আর এক জনকে যে কেমন করিয়া পাইতে পারে এই প্রেমে সেই বিষম সমস্যার সমাধান হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সীমাই আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া পাইতে দেয় না আমাদের পাওয়াটি সীমায় প্রতিহত হইতে থাকে। কিন্তু প্রেমে যখন একজনের সঙ্গে আর একজনকে মিলাইয়া দেয় তখন আনন্দের দ্বারা আবিষ্কার করি

যে বাহিরে যাহা সীমারূপে প্রকাশ পাইতেছে অন্তরে তাহার সীমা নাই।

কিন্তু তবু যুগল প্রেমে এই যে ভূমানন্দের পরিচয় আছে, নানা কারণে তাহাকে আমরা মুগ্ধভাবে অনুভব করি, তাহার চরম প্রকাশটি আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পরিস্ফুট হয় না। কারণ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ সম্পূর্ণ না হইলে, আমাদের আনন্দ মূঢ় হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞানময় হয় না। বৈরাগ্যের দ্বারাই অনুরাগ পরিপূর্ণরূপে সচেতন হইয়া উঠে; আসক্তিতে যখন জড়িত থাকে প্রীতি তখন আপনার স্বরূপ আপনি জানে না। প্রীতির যথার্থ স্বরূপই পূর্ণতার আনন্দে আপনাকে উৎসর্গ করা। প্রীতি যতক্ষণ ভোগের কাঙাল হইয়া থাকে ততক্ষণ সে আপনার ঐশ্বর্য্যটিই ভুলিয়া থাকে।

এই জন্যই একবার মৃত্যুর মধ্য দিয়া প্রেমের শোধন হওয়া চাই, ত্যাগের মধ্য দিয়া প্রেমের বোধন হওয়া চাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার মধ্যে এই তত্ত্বটি নিহিত আছে একথা আমি ঐ দুটি কাব্যের সমালোচনায় অন্যত্র বলিয়াছি। গৌরী বসন্তপুষ্পাভরণে সাজিয়া একদিন শিবের হাতে হাত দিয়াছিলেন কিন্তু সেই স্পর্শ নিত্য হইল না। তপের আগুণ জ্বলিল, বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া তবে তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইতে পারিল। বসন্তসখা একদিন পুড়িয়া ছাই হইল তবেই চিরবসন্তের অভ্যুদয় ঘটিল। শকুন্তলাতেও সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া অনুরাগের তপঃ সাধনা।

বসন্তপ্রয়াণের রচনাতেও এই তত্ত্বটি লেখিকার নিজের জীবনের মধ্য দিয়া সহজেই

প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমের পাওয়া জিনিষটি সম্পূর্ণ হইতে হইলে একবার যে তাহাকে মরিতে হয়; সে যে দ্বিজ, রাগ হইতে বৈরাগ্যে যে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবেই ডিম ভাঙা পাখীর মত সে মুক্তিলাভ করে, এই কথাটি লেখিকা আশ্চর্য্য করিয়া বলিয়াছেন।

বলিয়াছেন বলিলে গ্রন্থটির ঠিক পরিচয় হয় না—কিসে যেন লেখিকাকে তাহা বলাইয়াছে। নহিলে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার আর কোনো রচনায় ইহার সূচনা করিল না কেন? এই লেখাটিত নিতান্ত শোকের বিলাপ নহে। ইহাত অন্য কোনো লেখকের ছাঁদে হাত পাকাইবার প্রথম চেষ্টা নহে। লেখিকার অন্তরের মধ্যে যে প্রেমের নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল, বেদনার প্রচণ্ড উত্তাপে

তাহা এই রচনায় দানা বাঁধিয়া এইমাত্র প্রথম আবিষ্কৃত হইল। এই আবিষ্কার কেবল পাঠকের কাছে নহে ইহা লেখিকার কাছেও নূতন।

অথচ ইহাকে একেবারে খাপ ছাড়া রকমের নূতন বলিলে ঠিক বলা হইবে না কারণ, কেবল ত ইহা ভাবের বিকাশ নহে, দেখিতেছি ইহার মধ্যে চিন্তার প্রণালীও আছে। সে চিন্তা অশিক্ষিত চিন্তা নহে। আমাদের দেশের রস শাস্ত্রের ভাষা ও তাহার ছাঁদ লেখিকার বেশ জানা আছে। ইহাতে বোঝা যায় তাঁহার মনের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চয় ও চিন্তার শক্তি ছিল। সেইটে হৃদয়ের গভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়া জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া বিচিত্র রূপে দেখা দিয়াছে ;—এবং শোকের সঙ্ঘাতে ভিতরের

কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার একটি আকস্মিক বেদনা লেখিকার চিত্তে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে এই রচনাটি সাহিত্যে বড় অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইহা লেখিকার নবীন সৃষ্টি, অথচ ইহার মধ্যে প্রবীণতা আছে। ইহা তাজা, অথচ ইহা কাঁচা নহে। সমুদ্র মন্থনে অপ্সরী যেমন একেবারেই পূর্ণ যৌবনে প্রকাশ পাইয়াছে তেমনি শোকে লেখিকার হৃদয় মথিত করিয়া, এমন একটী পূর্ণাবয়ব রচনা প্রকাশিত হইল যাহা তাঁহার জাগ্রত চৈতন্যের তলদেশের অব্যক্ত লোকে সকলের অগোচরে পরিপুষ্ট হইতেছিল।

আমার প্রতি অনুরোধ ছিল এই রচনার তত্ত্ব কথাটিকে ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়া বুঝা-ইয়া দিতে। কিন্তু সে ভার আমি গ্রহণ

করিতে পারিলাম না। নিজের লেখার অস্পষ্টতার জবাবদিহি আজও আমার চুকিল না ; অতএব আমি চেষ্টা করিলে পাঠকদের কাছে অস্পষ্টকে অস্পষ্টতর করা অসম্ভব না হইতে পারে, হয়ত ইতিমধ্যেই তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এ লেখাটি যদি বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনা হইত, তবে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণী বিভক্ত করিয়া দিলে, ইহার মর্ম্ম কথাটি স্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইত। কিন্তু যাহা জীবনের অভিজ্ঞতায় নিগূঢ়রূপে পাওয়া বলিয়া প্রাণময় হইয়া উঠিয়াছে ; ছিন্ন ছিন্ন করিয়া তাহার উপাদানগুলি দেখাইতে গেলে তাহার আসল জিনিষটিই, তাহার প্রাণটিই গৌণ হইয়া পড়ে। আমার কাছে এই রচনার প্রাণময় সত্তাটিই আশ্চর্য্য ও মনো-

হয় ;—মানুষের মর্ম্মান্তিক একটি বোধশক্তি, বেদনায় জাগরিত হইয়া উঠিয়া, বিশেষ হইতে বিশ্বে ও বিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে সমস্ত ব্যবধানকে সহজেই দূর করিয়া দেখিতেছে ইহাই এই লেখায় আমি বুঝিয়াছি, ইহা বুদ্ধি করিয়া ভাবা নয় ; চিন্তা করিয়া পাওয়া নয় ; বিশেষ অবস্থায় মানুষের সমস্ত প্রকৃতি যখন অবিভক্ত ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন হৃদয় সহসা তীব্র চৈতন্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন সেই আলোকে একটী কোন্ গুহাহিতকে অনুভব করা গেল ইহাই এই রচনার বিষয়। এই রচনার মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়ের অনুভূতি আছে তাহার অনির্ব্বচনীয়তা কিছুই নষ্ট হয় নাই ;—তবে আমাদের লাভ হইল কি ? না, অনুভূতির সত্যতা ; তাহার

স্বতঃ প্রকাশিত স্বাভাবিকতা। আমরা বিশ্বের এবং আত্মার রহস্যলোকের একটী নূতন সাক্ষী পাইলাম। সেই সাক্ষী সরল অথচ শিক্ষিত এই জন্য তাহার সাক্ষ্যের একটী বিশেষ মূল্য আছে। এ সাক্ষ্য কেমন সাক্ষ্য? যেমন উদ্ভিদের প্রাণের উপর তড়িতের আঘাত করিয়া আমাদের বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ যে সাড়া পাইয়াছেন, সেই সাড়াটি তাঁহার উদ্ভাবিত অদ্ভুত যন্ত্রের সাহায্যে স্বতোলিখিত হইয়া ধরা পড়িয়াছে, এ তেমনি শোকাহত প্রেমের তাড়নায় মানব হৃদয়ের স্বতোলিখিত একটি বার্ত্তা।

এরূপ রচনাকে একেবারে জলের মত বোঝা যায় না—যে বেদনা পাইয়াছে ও প্রকাশ করিয়াছে তাহার সঙ্গে মন মিলাইয়া দিয়া তবে বুঝিতে হয়। নিজের যদি এই

জাতীয় অভিজ্ঞতা ও অনুভব শক্তি এবং অন্যের চিত্তের রহস্যলোকে প্রবেশ করিবার সহায় স্বরূপ কল্পনা বৃত্তি থাকে তবে অল্প হোক্ বেশী হোক্ বোঝা যায়,—সেই বোঝা বুদ্ধিগত না হইতেও তাহা কোনো না কোনো প্রকারে হৃদয়ের অধিগম্য হয়। পাঠকদিগকে এই বইখানিকে তেমনি করিয়া পড়িতে হইবে—বুঝিলাম না বলিয়া ইহাকে গালি দিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। সাহিত্যসভায় এই রচনাকে সম্মানের স্থান দিতেই হইবে, ইহাকে উপেক্ষা করিবার যো নাই।

এই গ্রন্থের তত্ত্ব বিশ্লেষণ আমি করিলাম না, তাহার কারণ আমি পারি না, আমি দার্শনিক নহি এবং সেরূপ ব্যাখ্যা আমার স্বভাবসঙ্গত নহে। আমাদের দেশে রস-

তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র আছে আমি তাহার কিছুই জানি না; এ গ্রন্থ যাঁহার রচণা নিঃসন্দেহে তিনি আমার চেয়ে এ বিষয়ে অনেক বেশি আলোচনা করিয়াছেন। তাই আমার বিশ্বাস, তিনি যাহা শিখিয়াছেন ও যাহা পাইয়াছেন তাহা পরবর্ত্তী রচনায় নিজেই উত্তরোত্তর উদ্ঘাটন করিবেন এবং সেইরূপে, তাঁহার জীবনের সহিত প্রকাশের যোগে, যে তত্ত্ব আপনাকে আপনি ব্যাখ্যা করিয়া চলিবে তাহারই জন্য নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকা আমি সঙ্গত মনে করি।

শান্তি-নিকেতন,

৮ই চৈত্র—১৩২০।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধপাঠ
১১	৬	অনন্ত	অখণ্ড
১৯	১২	পঞ্চভৌতিক	পাঞ্চভৌতিক
২১	৯	অ-কাল-গ্রস্থ	অ-কাল-গ্রস্ত
২৪	১০	তাহাত	তাহাতে
৩০	১৩	সে	যে
৩২	১৪	মর্ত্তে	মর্ত্ত্যে
৩২	১৫	নিয়ে	নিয়েই
৩৭	৫	কর্ম্ম	কর্ম্মে
৩৮	১৪	আতিথি	অতিথি
৪০	২	উচ্ছসিত	উচ্ছ্বসিত
৫৬	১৫	অর্চনা	অর্চ্চনা
৫৬	১৩	অর্চনীয়	অর্চ্চনীয়
৫৯	০	পূজার	পূজায়
৬০	৫	মরিচীকা	মরীচিকা
৬৭	১৬	সে	হে
৬৮	১০	বোঝে ?	বোঝে না ?
৭১	১৩	আত্মায়	আমায়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধপাঠ
৮০	৫	আবার	আধার
৮৫	৮	কে	কেহ
৯১	১৫	স্বরাজ্য	স্বারাজ্য
৯২	৮	ইপ্সিত	ঈপ্সিত
৯৮	৯	নিজে	নিজের
১০৮	১০	কুলায়	কুলায়ে
১০৮	১২	বায়	বহে
১১৪	১০	বহিরাংশ	বহিরংশ
১১৪	৩	আফ্সোস	আপসোষ
১৩২	১	অজ্ঞানের	জ্ঞানের
১৪০	১৪	স্বপ্ত	স্বস্ত
১৪২	২	ত্রস্ত	স্রস্ত
১৪৩	১	বিরহ	বিরত
১৪৩	৪	কি	কে
/০	৬	অস্তুত	অস্তুতঃ
৵০	২	গিয়াও	গিয়া
৶০	১৬	ঐশ্বর্য্যটিই	ঐশ্বর্য্যটি

সূচীপত্র।

আদিলীলা।

(বিশেষের পথে)

মধ্যলীলা।

(বিশ্বের পথে)

১। দেওয়ার কথা

২। প্রথম দান

৩। দ্বিতীয় দান

৪। তৃতীয় দান

অন্ত্যলীলা।

(বিশ্বাতীতের পথে)

আদিলীলা ।

(বিশেষের পথে)

বসন্ত-প্রয়াণ।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

উঠ, তব মৃত্যুঘোর,
ধরিয়া প্রণয় ডোর।
চল যেথা নিশাভোর
ত্রিদিবের ছন্দে।

অসীমের বেলোপরি
নিভৃতে মন্দির গড়ি,
প্রশান্ত মূরতি হেরি,
ধ্যানানন্দে।

আমি ত একলা ছিলাম। কেন তুমি ক্ষণেকের জন্য আমার জীবনের সাথী হয়ে আমাকে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত রেখে অকালে লুকালে ?

হে আত্মা! যেদিন তুমি আমার আত্মাতে প্রতিঘাত করিলে, সেদিন আমি তোমার মোহন মূর্ত্তিতে অন্ধ হয়েছিলাম। সেদিন তোমার সবই ভাল মনে হয়েছিল। তোমাকে হৃদয়ের মাণিক বলে গ্রহণ করেছিলাম। আমি বালিকা ছিলাম। আমার কোন জ্ঞান ছিল না। তোমাকে পাইবার পর, আমার কোন চিন্তার শক্তি ছিল না, সত্য জানিবার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তুমিই সব, তোমাতেই সব পাব, এই মনে হয়েছিল। তুমি ও আমি দুজনে আমাদের জগৎ সৃষ্টি করেছিলাম। কই আমাদের স্বকৃত জগৎও ত আনন্দপূর্ণ ছিল না; সেখানে ত চিরশান্তি বিরাজ করিত না? কেন আমাদের জগতে অশান্তি ছিল? আমাদের জগতের সৃষ্টি হয়েছিল বটে, কিন্তু আমরা সে জগতের

কর্ম্ম কি তাহা বুঝি নাই। দুজনের কর্ম্মে একজনকে নীরব ও স্তিমিত, অপরকে চঞ্চল ও মুখর হইতে হয়। একজন প্রকাশ করে, আর একজন দর্শন করে। একজন ভোক্তা, আর একজন ভোগের সহায়। এক-জন রস প্রদান করে, আর একজন তাহা পান করে। একজন স্পর্শের অনুভূতি, আর একজন স্পর্শেন্দ্রিয়। একজন ঘ্রাণের উপকরণ, আর একজন ঘ্রাতা। একজন মন্ত্র উচ্চারণ করে, আর একজন তাহা ধারণ করে আমাদের জগতে আমরা দুজনেই চঞ্চল ছিলাম। কেবল চেয়ে তৃপ্তি পেতাম, দিয়ে তৃপ্তি, জ্ঞানে তৃপ্তি আসিত না। তুমি কিন্তু আগেই বুঝেছিলে, তাই ক্ষমা করেছিলে। এইটুকু তুমি ও আমি দুজনে দুজনকে বুঝেছিলাম।—

তুমি আমার পথে আলো দেখাতে এসেছিলে। আমার পথে বাতি রেখে আজ তুমি চলে গেছ। এখন সেই আলোতে আমার পথ চল্‌তে হবে। কিন্তু আলো ধরে পথে চল্‌বার আগে মনে হইত তুমি কৈ? তোমাকে হারালাম বুঝি। তোমার রূপ, তোমার সৌরভ, তোমার স্পর্শ, তোমার স্বর, এ সকলের দ্বারা আমার যে বাসনা জাগরিত হইয়াছিল, তাহার অতৃপ্তিতে তোমাকে হারালাম বলে কেবল হাহাকার। হৃদয় প্রাণ রুদ্ধ করে তোমাকে, তোমার ছায়াকে, ধরে রাখিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে হাহাকারের উপশম হইল না।

কিন্তু নাথ! আমি আজ রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়া আকাশের আলোয় দাঁড়াইয়া বুঝিয়াছি তোমাকে হারাই নাই। তুমি

যে আমার আকাশ। তোমাকে হারাব কোথায় ?

তোমাকে ত হারাতে পারি না। তুমি যে আমার স্থিতি, আমার স্মৃতি, আমার জ্ঞান, আমার অজ্ঞান। তুমি আমার অন্তরাকাশ। তোমাকে ত চেষ্টা করিয়া ধরিয়া রাখিতে হবে না। যতদিন আমার আমিত্ব উপলব্ধি করিব, ততদিন তুমিও আমার জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত থাকিবে।

জরাগ্রস্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি বলে, বিশ্ব-প্রেমের স্মরণ লও, পূজা কর, পৃথক প্রেম নশ্বর। বিশ্বপ্রেমেই বিশেষ প্রেমের অবসান কর।

অজর অমর আত্মা বলে, বিশ্বপ্রেম! বিশ্ব প্রেম কোথায় ? সেও কি আমার মধ্যে নয় ? সেও ত আমার জ্ঞানে এই জ্ঞানে যদি

প্রেমের প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে কি বিশেষ প্রেম, কি বিশ্বপ্রেম উভয়ই নশ্বর।

এই যে আমার হৃদয়ে প্রত্যেক জীবিত পদার্থের সহিত একটা সহানুভূতি ও ভালবাসার যোগ বুঝিতে পারি, তাহা কি? কেন আমার মন সবাইকে চায়? কেন আমার জীবনে বসন্ত বার বার আসে? কেন এক কর্ম্মে সব তৃপ্তি হয় না? কেন এক আধারে দেওয়া সম্পূর্ণ হয় না? ইহা কি বিশ্বপ্রেম উপলব্ধি করিবার জন্য নয়? বিশেষের পথেই বিশ্ব আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। অথবা বিশ্বপথের পথিক বলিয়াই আমাদের বিশিষ্টের সাক্ষাৎকার হয়। বিশ্ব ও বিশেষ পথমাত্র, একটা গোলপথের দুইটা বিপরীত দিক; কিন্তু গম্য তাহাদের সঙ্গমস্থল; ও তাহা এক। অবশ্য ইহা ধরিতে কিছু সময়

লাগে। প্রথমে ইহা আমরা আদান প্রদানে বুঝিতে পারি। যখন অযাচিত ভাবে আমরা কাহাকেও কিছু দিই, তখন দেশকালপাত্র বিচার করে, দেনা পাওনার হিসাব করে, দিই না। তবে দিয়ে যদি তৃপ্তি আসে তবে দিতেই থাকি। তৃপ্তির অবসানে জ্ঞান আসে। তখন বুঝি দেওয়াতেই দেওয়ার সার্থকতা। ইহাই নিষ্কাম নির্ব্বিশেষ দেওয়া। বিশেষ বস্তু বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা তৃপ্তির ধারণা বাহ্য ধারণা মাত্র। যাকে দাও সেত প্রতিরূপ (symbol), যে দেয় সেও প্রতিরূপ ; এই উভয়ই আত্মার লীলার সহচর ও সহায়ক। আত্মদানই গণ্য ও তাহা হইতেই তৃপ্তি। তৃপ্তির অবসানে জ্ঞান, জ্ঞানে আনন্দ, এই আনন্দই প্রাণ। রসের জন্যই রূপ, রূপের জন্য রস নহে ; নানা আধারেও এক রসের অভিব্যক্তি,

এক আধারেও নানা রসের অভিব্যক্তি। রসই বিশ্বপ্রেম, রসই বিশেষপ্রেম। বিশ্বরূপ ও আত্মচৈতন্য, কে বড় কে ছোট এ বিচারের শেষ কোথায় ?

তবে এখন বিশ্বপ্রেম কোথায় তাহা জানিলাম। তাহা আমারই জ্ঞানে, আমারই আনন্দে। যে আমার বিশেষপ্রেম সেই আমার বিশ্বপ্রেম, সে যে আমার কেবল প্রেম। তবে আর হারাব কেমন করে ?

তবে প্রেম, এস তোমায় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা করি। এইরূপে তোমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তোমার পূজা আরম্ভ করি। কি করিলে তোমার পূজা হইবে ? আমার সেই জ্ঞানের পূজা, প্রত্যেককে দিয়া তোমার দেবার ইচ্ছাকে তৃপ্তি দেওয়া ; আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সেবা ও ভক্তি বিকশিত করে

আত্মায় অর্পণ করা, এই তোমার পূজা। এখন যেন বিশেষ আধারের কথা বিগ্রহের কথা মনে না আসে। পরে হে বিগ্রহী, আমার তৃপ্তিতে তোমাকে তৃপ্তি দেব। আমাকে অনুসন্ধান করিলেই তোমাকে পাব।

'তুমি' আমার কাছে এসেছিলে। কেন এসেছিলে কেন গেলে? আমি আমার কথা শুধু জানি। তোমার কথাত আমি জানি না! আমার কাছে কিছু পেতে এসেছিলে? আমাকে তোমার জ্ঞানে পেয়েছিলে? না পেয়ে ফিরে যাও নাই ত! তোমার কথা আমি কিছুই জানি না। আমি তোমাকে আমার জ্ঞানে পেয়েছি সেই শুধু জানি। তোমাকে আমি তুমি বলে কিছু জানি না তোমাকে আমি 'আমি' বলে জানি। তুমি আমার 'আমি'তে থাক।

তবে হে আমার চির-অস্তগত তুমি! আজ এস, তোমার আত্মবিসর্জ্জনে যে আলো দেখাইয়াছ তাহার দ্বারা নিজের মধ্যে নিজের জ্ঞানের উপাসনা করি। সেখানেই তোমার জ্ঞানের নিত্য উদয় হউক। আর সেই ভাস্বর দীপ্তিতে আমার মনের আঁধার কাটিয়া যাক। আর যেন মন বাহিরে এসে আঁধারে তোমার জন্য হাহাকার না করে। কেবল যেন অন্তরের দিকেই তার দৃষ্টি থাকে। আবার কোন কারণে তোমাকে হারাতে পারি, এ ভয় যেন আমার মনে না আসে। তুমি চিরন্তন হয়ে আমার জ্ঞানে বিরাজ কর, ও আমাকে নিত্য নূতন আনন্দ দান কর।

জানিনা কোন জ্ঞানে তোমার সৃষ্টি হয়েছিল। কোন জ্ঞানের বলে তুমি নিজেকে এমন করে প্রকাশ করিলে। তোমার প্রকাশ

আমি দেখিলাম। তাহাতে আমার জ্ঞানের সৃষ্টি হইল। তোমার জ্ঞান তোমার প্রকাশের কারণ এবং তোমার প্রকাশের অন্তর্লীলাই আমার জ্ঞানের প্রকাশ। তবে তোমার জ্ঞানই আমার জ্ঞান। তবে এস, তুমি আর আমি এক অনন্তজ্ঞানে পরিণত হই। সেই জ্ঞান আমাতে প্রকাশিত হউক, আর সেই প্রকাশে জ্ঞান-পরম্পরা ক্রমে, বিশ্বাত্মার বিশ্বজ্ঞান প্রতিভাসিত হউক।

দেওয়া পাওয়া।

আমি তোমাকে পেতে চাই। কিন্তু পেতে গেলে যে দিতেও হয়। আমি যদি তোমাকে পেতে চাই, আমার ভালবাসা, আমার ভক্তি, আমার সেবা, এই সকলের বাসনা যাহা আমার ভিতরে অতৃপ্ত আছে, তাহার তৃপ্ত্যর্থে আমি যদি সত্যসত্যই তোমাকে চাই, তবে আমার দিতেও হবে। যেখানে হৃদয় নিজেকে দান করে নাই, সেখানে পেয়ে কোন তৃপ্তি নাই। না দিলে পাওয়া যায় না।

ভাল, পাওয়া যেন স্বপ্রমাণ; নিজের তৃপ্তিতেই অবসান, কিন্তু দেওয়া কি পরতন্ত্র নহে? বাহিরের পাত্র, তাহার গ্রহণ, গ্রহণে

তৃপ্তি, এ সকলের অপেক্ষা রাখে না ? কে আমার দান গ্রহণ করিবে ?

তবে দেওয়টা কি ? কেন দিই ? কাকে দিই ? কি দিই ?

যেখানে অযাচিত ভাবে দিই, আমার প্রীতি, ভক্তি ও সেবার দ্বারা অপরের অভাব পূরণ করিয়া তৃপ্তিদান করি, সেখানে দেওয়া মানে কি আমার ভিতরেরই আকাঙ্ক্ষাকে স্ফূর্ত্তি ও অবকাশ দেওয়া নয় ? আর তাহার বিকাশে যখন তৃপ্তি উপলব্ধি করি, তখনই কি পাওয়া হ'ল না ? দেওয়া পাওয়া ভেবে দেখ্‌তে গেলে দুটা একই জিনিষ, বা এক জিনিষের দুটা দিক। দিলেই পাই। আর পেতে গিয়েই দিই। কিন্তু ঠিকভাবে না দিতে পারিলে কেবল ভাবি দিই কিছু পাই না।

যে কোন কারণেই হউক এই দেওয়া পাওয়ার বন্ধ হওয়াই বিচ্ছেদ। এখানেই মানুষে মানুষে আত্মায় আত্মায় ব্যবধান। ইহাই প্রেমিকের বিরহ। ইহাই প্রকৃত হারান। আমি তোমাকে হারাইয়াছিলাম।

হে আত্মা! যেদিন তোমার কর্ম্ম শেষ হ'লে চলে গেলে, আমায় বিদায় বল্‌তে পারলেনা, সেদিন কি আমার বেদনা ইন্দ্রিয়ের অন্তরাল ভেদ করে তোমায় স্পর্শ করেছিল? তোমার আত্মা কি আমার অন্তঃস্পর্শ করে শান্তি দিতে চেয়েছিল? তুমি কি আমায় কিছু দিতে চেয়েছিলে কিন্তু আমায় পাও নাই? তুমিও কি আমায় হারাইয়াছিলে?

আমি তোমার কথা জানি না। তবে আমার সেদিনকার কষ্টের কারণ আজ

বুঝেছি। সেদিন, তুমি না হলে যে আমার অন্তরস্থ ভালবাসা, ভক্তি, সেবা, এদের কিছুরই অবকাশ হবে না, এই বোধ অন্তরে জেগেছিল। সেদিন আমার দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল বলে কেঁদেছিলাম। সেদিন আগে দিয়ে পরে তৃপ্তি চেয়েছিলাম। এ তৃপ্তিও আমার স্বার্থ, জানি নাথ, কিন্তু এ স্বার্থও তোমার জন্য।

তোমাকে দিতে পার্‌বনা, তোমার সেবা কর্‌তে পার্‌বনা বলে কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু সে কষ্ট আর নাই। কষ্টের কারণ জেনে আজ সে কষ্ট নাই। আজ বুঝিতেছি আমার দেবার পথ খোলা রয়েছে, তাই পাবার পথও খোলা। তুমি জ্ঞানপথে আবার এসেছ! আর জ্ঞানপথেই তোমাকে আমি দেব। ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ না হ'লে কি জ্ঞানপথ

উন্মুক্ত হয় না? এ জ্ঞানপথের কি একদিন শেষ নাই? হে পথিক! এ পথের শেষে কি তুমি আমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে?

হে আগন্তুক! একদিন তোমার আনা-গোনার শেষ হবে। সেদিন আমি তোমাকে চিরকালের জন্য পাব। তখন তুমি 'বিদায়' ব'লে চলে যেতে পার্‌বে না।

যেমন ঠিকভাবে দিতে না পার্‌লে বিচ্ছেদ, তেম্‌নি ঠিকভাবে দান গ্রহণ কর্‌তে না পার্‌লেও বিচ্ছেদ। মনে পড়ে সেই এক দিনের কথা, যে দিন আমি তোমার কাছে বিদায় চেয়েছিলাম তুমি বাধা দাও নাই। তুমি নীরব হয়েছিলে, কোন কথা বল নাই। সেদিন আমি চেয়েছিলাম, তুমি তোমার সর্ব্বস্ব আমায় দাও আমি সব ভোগ

করি। সেদিন বুঝিলাম ইন্দ্রিয় ভোগ্য হইলেও পাওয়া যায় না। আর আজ জানিতেছি, ইন্দ্রিয় প্রাপ্য না হইলেও দেওয়া যায়। তাই আজ আমার আর না পাওয়ার কষ্ট নাই; আর সেদিন যে তুমি কথা বল নাই, হাত ধর নাই, ফিরে তাকাও নাই, সেই যে আমার নিষ্ফল প্রেম, তাহার জন্য আমার আজ কোন কষ্ট নাই। তাহাতে ত আমি কিছু হারাই নাই। তবে তুমি যদি আমার কাছে কিছু চেয়ে থাক, তবে সেই একদিনের জন্যও তুমি আমাকে হারাইয়াছ। আর যদি তাহা না হয়, যদি তুমি আমাকে না চেয়ে থাক, তাহা হইলে এইখানেই সেই বিচার শেষ করা ভাল। মৃত্যু আসিয়া সকল নিষ্ফলতা নিষ্ফল করিয়াছে।

তবেই কষ্টের কারণ দুই। এক দিতে না

পারলে যে কষ্ট হয়, অপর না পেলে যে কষ্ট। দেওয়া পাওয়া যদি একই হয়, তা হ'লে দিলে আর পেলেনা, এর মানে কি? তার মানে তুমি আগে পেতে চাও, না আগে দিতে চাও, আগে তৃপ্তি চাও, না আগে তোমাকে বিকশিত করতে চাও। নিজকে বিকশিত করবার সহায়ক অভাবে, দানের পাত্র বা আধারের অভাবে, যদি কষ্ট পাও, তবে সে কষ্ট ত্যাগ করোনা। সেই অভাবের জ্ঞানই, অভাবের পূরণ করিবে। জ্ঞানই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা যখন জ্ঞান ধ্যানে পরিণত হয়। কিন্তু তোমাকে আরাধনা করে, অপর কেহ ধন্য হো'ক বা তোমাকে আত্মসর্ব্বস্ব নিবেদন করুক, এই অভাবে যদি কষ্ট পাও তবে সে কষ্ট বৃথা। এখানে তুমি কিছু দিলে না, তুমি কিছু পাবেওনা।

তাই বলি অন্তরাত্মা! এতদিন তুমি কাহাকেও দিতে পার নাই। দিনে দিনে জীর্ণ শীর্ণ হতেছিলে। এতদিন তুমি ক্ষুধিত অতৃপ্ত ছিলে। আজ ত আর তা নয়। আজ তোমার বসন্ত, তোমার দ্বারে, অতিথি। আজ তবে প্রাণ ভরে দাও। আর কর্ম্মশূন্য হয়ে বসে থেকোনা। অতিথির সেবা কর। তোমার অতিথিও তোমার সেবা ঠেলে ফেল্‌ছেনা। যে ভাবেই দিচ্ছ সেই ভাবেই নিচ্ছে। আর অতৃপ্তি অশান্তি মনে এনোনা। এখন আনন্দ কর। নিরানন্দ হয়ে এই বিশ্বে দ্রোহ এনোনা। তোমার এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যে মহাপ্রাণ অধিষ্ঠিত, তাহার অকল্যাণ করোনা। মৃতের চিতা ছাড়িয়া উঠিয়া আইস। প্রাণই তোমার দ্বারে আজ অতিথি। এই প্রাণকে চিনিতেছ না? এ যে সেই।

'আমি'র ইতিহাস।

ভাল, এই যে "আমি" জ্ঞান, আমার অন্য জিনিষ হইতে পার্থক্য জ্ঞান, ইহা কবে কোথা হইতে আসিল? যখন জননীর গর্ভে ছিলাম বা যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, তখন এই "আমি" কোথায় ছিল? তারপর শৈশবকালের কথা, সে যে আলোও নহে, আঁধারও নহে, জ্ঞানও নহে অজ্ঞানও নহে, তারপর কোথায় কোন সময় হইতে একটি আবছায়া, তারপর ছায়া, তারপর একটি "আমি"র প্রতিরূপ মনের স্বচ্ছ আয়নায় ভাসিয়া বেড়ায়। তবে যে সময়ের কথা একে-বারে মনে আসে না, তখন ত 'আমি' বলিয়া আমাকে চিহ্নিত করিতে পারি না। তখন

আমি একটি পৃথক সত্তা, এখানে পৃথক হয়ে বর্দ্ধিত হ'ব, এ জ্ঞান ছিল না, আর তাই বুঝি আমার স্মৃতিও নাই। তবে বলি, আমার সেই এক কাল ছিল। কিন্তু সে কালে কি হয়েছি, তাহা মনের আয়নায় ভাসে না। তবে সেই কালটাকে কি বলিব? সে কাল না অ-কাল? মৃত্যুকে যে কাল বলে, লোকের যে কাল হয়, তাহা কি এই কাল? হে আমার অ-কাল-গ্রস্ত! তোমার কালের কাল হইয়াছে। তুমি কাল-ভয়ের অতীত।

এখন আমার কালের কথা বলি, ও সেই কালের মাপকাটি নির্দ্ধারণ করি। যখন হ'তে আমার আমি জ্ঞান এল, তখন কালের মূল্য বুঝিলাম। এবং আমি, সেই জ্ঞানের দ্বারাই কালকে সীমাবদ্ধ করিতে শিখিলাম। পূর্ব্বের

কাল,অ-কাল, কেননা তাহার আরম্ভ ও শেষের সীমা বুঝি না। কিন্তু যখন হইতে আমরা সীমাবদ্ধ কাল জ্ঞানে, "আমি"কে পৃথক করে বুঝিতে শিখি, তখন হইতেই আমাদের "আমি" সতত একটা সম্বন্ধ খোঁজে। অজ্ঞাতসারে নানারকম সম্বন্ধ পেতে চায়। বাপ মা, ভাই বোন, খেলার সাথী ও বন্ধু এইরূপ নানা সম্বন্ধ পায়। এবং প্রত্যেক সম্বন্ধেই নিজেকে অজ্ঞাতসারে ও অযাচিত ভাবে, দান ক'রে নিজেকে পায়। সবাইকে মন চায়, কিন্তু সম্প্রতি একজনকে বিশেষ করে চায়। একজনের সহিত এমন একটা সম্বন্ধ লিপ্সা হয়, যে তাহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্তও চলে না। মন সতত তাহার স্পর্শের জন্য ব্যাকুল, তাহার অনুপলব্ধিতে যেন "আমি"রই অনুপলব্ধি হয়। এই একজনের সহিত সম্বন্ধ বোধ না

আত্মার এখন স্বাবলম্ব ও স্বতন্ত্র গতির সূচনা হয়। আর সে স্বভাবের হাতে [illegible]লিকা নহে। এখন সে মনের [illegible] এ যুগল [illegible] হইতে আসিল ? আদিতে কি এক ছিল, না দুই ? যোগ না বিয়োগ ? এরাই কি আদিম চক্রবাক ও চক্রবাকী, জন্মে জন্মে যোগ বিয়োগকে অনু-ধাবন করিতেছে ; আবার বিয়োগ, যোগকে ? এরাই কি দ্বন্দ্বের আদিম সৃষ্টি ? হে আমার দ্বন্দ্ব ! আজ তুমি দ্বন্দ্বাতীত।

কিন্তু এ যুগল [*affinity*] আত্মার জন্য ; যুগলের জন্য আত্মা নহে। তাই আত্ম-বিকাশের সহিত এই যুগল সম্বন্ধেরও বিকাশ আছে।

এই এক জনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ [affinity] প্রত্যেক জীবনে দুবার ঘটা চাই।

কাল,অ-কাল, কেননা তাহার আরম্ভ ও শেষের সীমা বুঝি না। কিন্তু যখন হইতে আমরা [affinity] [illegible] জ্ঞানে, "আমি"কে পৃথক করে আত্মার দুবার না পে[illegible] আমাদের "আমি" না পেলে, যথার্থ তৃপ্তি বোধ হয় না। আর এই বোধ না হ'লে কর্ম্মের অবসান হ'তে পারে না। কর্ম্মের অবসান না হ'লে জ্ঞানও আসিতে পারে না।

প্রথম যে রূপে, যে আধারে, যে মূর্ত্তিতে আমার তৃপ্তি, তাহাতে তৃপ্তির অধ্যাস মাত্র, বাস্তব তৃপ্তি নহে। তখন আমরা সেই তৃপ্তি যথার্থ তৃপ্তি বলিয়া মনে করি; যাহা পাই, তাহা ধ্রুব, সত্য, ও অপরিবর্ত্তনশীল মনে করি। যতদিন পর্য্যন্ত এই প্রথম পাওয়ার মূর্ত্ত অবলম্বন মনের চক্ষু হইতে অপসারিত না হয়, ততদিন এই ভুল বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল

আত্মার এখন স্বাবলম্ব ও স্বতন্ত্র গতির সূচনা হয়। আর সে স্বভাবের হাতে পায়ে লিকা নহে। এখন সে মনের মতন, যে সেই তাহাকে দেয়. এখনই ভাবি যে সত্যসত্যই আত্মার তৃপ্তি হইল। প্রথম তৃপ্তি অজ্ঞতাতে হয়, ইহা কেবল স্বাভাবিক ক্রিয়া, [Instinctive,] ক্ষুধার্ত্ত অন্ধ প্রবৃত্তির হাতড়ান। ইহা যে বাসনার তৃপ্তি তাহাও নহে। বরং এই অবস্থায় বাসনা যে কি, তাহা আমাদের ভিতরে জাগরিত হয়। এ পর্য্যন্ত বাসনার তৃপ্তির আরম্ভই হয় না। কেবল কতকগুলি যৌন প্রবৃত্তির কতকটা তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু বিদেহ বাসনার কোন তৃপ্তি হয় না। এই হইল প্রথম পাওয়া, তাহাতে কেবল "আমি"র পৃথকত্ব, একত্ব ও সতন্ত্র-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই আমির বিদেহ বাসনা জাগরিত হয়।

কাল,অ-কাল, কেননা তাহার আরম্ভ ও শেষের [illegible] বুঝি না। কিন্তু যখন হইতে আমরা আসে, তখ[illegible] জ্ঞানে, “আমি”কে পৃথক করে তখন সে খোঁজে, সে [illegible] আমাদের “আমি” তৃপ্তি। তাহার চিন্তার তৃপ্তি কোথায়? তখন সে জ্ঞানে দিতে চায়, জ্ঞানে পেতে চায়; কিন্তু সে জানে না, কোথায় তার তৃপ্তি আস্‌বে। প্রথম পাওয়ায় যে কিছু পায়নি, কিছু স্বত্ব পায়নি, তাহার নিজের কোন তৃপ্তি হয়নি, তাহা বোঝে। মন নিরাশ হয়। আনন্দ থাকে না, সবই শুষ্ক, সবই কঠিন বলে বোধ হয়; এবং এই নিরাশের ভাব হ'তে সে নিজকে বুঝিতে শেখে। আর এই নিরাশের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আত্মশক্তি অর্জ্জন করে, যদি মোহ না আসে, যদি মূর্চ্ছিত না হয়!

আত্মার এখন স্বাবলম্ব ও স্বতন্ত্র গতির সূচনা হয়। আর সে স্বভাবের হাতে পুত্তলিকা নহে। এখন সে মনের মতন মূর্ত্তি গড়ে, তাহাকে দেয়, এবং নিজের তৃপ্তির নিজেই আধান করে। এই যথার্থ তৃপ্তিও একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে আসে না। অংশে অংশে আসে। অনেকবার মূর্ত্তি ভাঙ্গতে গড়্‌তে হয়। তাহাকে বদ্‌লে বদ্‌লে নিতে হয়। এবং এই ভাঙ্গা গড়াতে বাসনাও তৃপ্তি পায়। এ তৃপ্তিতে যে শিল্পীর উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি কতকটা চরিতার্থ হয়। এখানে যাহা আমরা দিই তাহাই আমরা পাই, এখানে দেওয়া পাওয়ার সম্বন্ধটা নিত্য, সুতরাং অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে না। এ বাসনাও আমি উচ্চ শ্রেণীর প্রবৃত্তি [instinct] মনে করি। হতে পারে কাজে সবই এক, কিন্তু ইহা

জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত তাই উচ্চ বলিয়া জ্ঞান করি। যদি আমি দ্বিতীয় বারের মূর্ত্তি ঠিক করিয়া ধরিতে পারি এবং সেখানে দান করে তৃপ্তি পাইবার অবসর পাই, তবে কিয়দংশে পরিতৃপ্ত হ'ব, ও একদিন সম্পূর্ণ তৃপ্তিও আস্‌বে।

এই তৃপ্তির আস্বাদ দ্বিতীয় পাওয়াতেই হয়। তাহার পর এই দ্বিতীয় বারের মূর্ত্তি অপসারিত হলে, আর কষ্ট থাকে না। তখন বরং পরিপূর্ণ তৃপ্তির অন্বেষণে মহা-প্রয়াণের পথ পরিষ্কার হয়। তখন বরং আমার মনের ভিতরে, অতি অভ্যন্তরে, যে জ্ঞানের আভাস আসে, তাহার আলোকে সেই মহা-প্রয়াণের গহন পথে চলিতে থাকি।

আমার ধারণা প্রতি আত্মা দুবার পেতে পারে। তার দুবার করে বিশেষ সম্বন্ধ

[affinity] পেতে হবে। তারপর আরও যুগল [affinity] আস্‌বে। তখন আর তারা তার জন্য নয়, তার যুগল [affinity] নয়, তবে সে তাদের যুগল [affinity]। এইরূপে তাহাকেও অনেকবার মনের মানুষ [affinity] সাজ্‌তে হবে। তবে তাহা কেহ জান্‌বে না। কেবল সেই জানবে, সে যে সেজেছে।

আমার প্রথম পাওয়া

যে দেহাত্মায় আমি প্রথম পেয়েছিলাম, বা পেয়েছিলাম বলে বোধ হয়েছিল, তাহা আজ পৃথক দেহাত্মা ভাবে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভাবে, আমার সম্মুখে নাই। সে আজ জ্ঞানরূপে, অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে। জ্ঞানরূপে বলিতে পারিনা, কারণ জ্ঞানত এখন হয় নাই। জ্ঞানেত অশান্তি নাই, অতৃপ্তি নাই, সংগ্রাম নাই। সেখানে কর্ম্ম চঞ্চলতা নাই। সেখানে আমি ও আমার বাসনা নাই। সে কেবল জ্ঞান, তাহার রূপ নাই। সে জ্ঞান, সে এক রস। কিন্তু আমি সেই রস পাই নাই। তাই জ্ঞানও হয় নাই।

তবে এই যে আমার প্রথম বসন্ত, আমার জীবনের প্রথম বসন্ত, তোমাকে দিয়া আমি কি

পেলাম? তুমি এসে আমায় কি দিলে? এ তোমার প্রথম আগমন। এ আমার প্রথম পাওয়া। তুমি দুদিনের জন্য এসেছিলে, দুদিন পরে ফিরে গেলে। তোমাকে দিয়া আমি কি পেলাম। আমার তৃপ্তি কোথায়, আমার কল্যাণ কিসে হবে, আমার জ্ঞানের পথ কোন দিকে, তাই বুঝেছি। শুধু তোমাকে দিয়া আমার দিক-নির্ণয় হয়েছে। একটু আকর্ষণ বুঝেছি। আর কিছু পাই নাই। জ্ঞান পাই নাই। কিন্তু অজ্ঞাতের প্রতি বিশ্বাসের বল পাইয়াছি। তোমার আকর্ষণ ধরে যে চল্‌তে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই বলি, হে বসন্ত, এই তোমার আমার দেওয়া-পাওয়া। এখানেই এর শেষ! তোমার দ্বারা যা পেয়েছি, এখন তাই নিয়ে জীবন পথে, একলা চল্‌তে দাও।

যদি ইচ্ছা হয় ত আবার এসো। এখন বিদায়! বিদায়!

হে আমার বসন্ত! তুমি যে ফুল ফুটাইয়াছ, তোমার আগমনে যে ফুল ফুটেছে, তাই নিয়ে একটু জীবনের খেলা ঘরে খেল্‌তে দাও। আমার যে খেলার সাধ এখনও মেটে নাই। এখনও জীবন যে আমার খেলাঘর। আকাশতলে অসীমের বেলাভূমিতে এ কোন শিশুরা বালুকাস্তুপে ফুল লইয়া খেলিতেছে। শূন্যের নিঃসঙ্গে বিস্মৃতিতে বিভোর হয়ে একি খেলা আমরা খেলিতেছি। হে আমার জাগ্রত স্মৃতি! একবার তোমায় ভুল্‌তে দাও। হে অমর! আমি তোমার অমরতা চাহি না। আমি যে মর্ত্ত্যে। তোমার দুটা ফুল নিয়েই কৃতার্থ হব। তোমার অমর তেজ সম্বরণ কর।

হে বসন্ত, যখন তোমার ফুল ফুরাইয়া যাবে, সব শুষ্ক হয়ে আস্‌বে, তখন ত আমার খেলাঘরের সাথীদের দিয়ে চল্‌বে না। তখন হে আমার জীবন বসন্ত! তুমি আবার এসো। এসে আবার আমায় ডেকো। তোমার রূপ যেন আবার দেখি।

হে আমার বসন্ত! হে আমার অন্তরের ধন, বিদায় বলে কষ্ট দিলাম না ত? কষ্ট দিই নাই নাথ! তাহলে যে আমিও কষ্ট পেতাম। আমি যে তোমাকেই চাই। তার সঙ্গে আর সবাইকে নিয়ে, আমার খেলাঘরের সাথীদের নিয়ে, তোমার আমার মিলনের মধ্যে ফেল্‌তে চাই। সেখানে সবাই থাক্‌বে। বিশ্বের মেলা বস্‌বে। সেই মহোৎসবে কেহ অভুক্ত থাক্‌বে না। কেহ নিরানন্দ থাক্‌বে না। কাহাকেও ছাড়িব না। কাহাকেও

বাহিরে রাখিব না। তবে আর কষ্ট কই? যাহা বাহিরে তাহাই কষ্টের কারণ। তুমি ত বাহিরে নও, অন্তরে। এস আমার অন্তরে। এবং সেখান হইতে, আমার বাহিরকে ও বহির্জগতকে ভিতরে টান।

আমার দ্বিতীয় পাওয়া।

অনাশ্বাসে দিন যায় চাহি পথ পানে।
কাহার আহ্বান শূন্য মরমেতে পশে,
সাগরের রোল যেন নৈশ আকাশে,
অজানা ত্রাস এক জাগায় পরাণে।

অবোধ হায়রে আমি! কিছুই জানিনে
কিসের তৃষাতে কে যে, কার স্পর্শ আশে,
নিত্য-নব-লীলা-চর, মায়া-মোহ-বশে,
ক্ষুদ্র হয়ে আসে মোর সীমাবদ্ধ জ্ঞানে!

আমার খেলা হ'ল না। আমার খেলাঘরের ফাঁক দিয়া যে শূন্য দেখা যায়! সে শূন্য ধূ ধূ করিতেছে। সে যে আমায় বেষ্টন করে আছে। সে শূন্যের বিস্মৃতি না আস্‌লে খেল্‌ব কেমন করে? আমায় কে শূন্যমার্গে ডেকেছে। আমার মন যে উন্মনা, কিছুতেই বস্‌তে চায়

না। তাই দেখে, যে যার সব সরে পড়েছে। কেহই আমার কাছে নাই। সব দিকই শূন্য। এই জন্য ফিরে এসে ঘরে বদ্ধ হয়ে বসে আছি। এরূপ সব আদান প্রদান বন্ধ করে, কর্ম্মশূন্য হয়ে, কেও তৃপ্তি পেতে পারে? জ্ঞানান্বেষণে বাহির হ'লাম, কিন্তু যে জ্ঞানে আমার তৃপ্তি তাহা কিছুই পেলাম না। অশান্তি হাহাকার নিয়ে ফিরে এলাম। বুঝ্‌লাম তৃপ্তি কোথাও নয়; তৃপ্তি কর্ম্মে। তবে সকলকার তৃপ্তি সব কর্ম্মে নয়। যার তৃপ্তি যে কর্ম্মে, সে কর্ম্ম খুঁজে নিতে হবে।

একবার আমার কর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছিল, বসন্তের আগমনে। তখন নব নব আশা ও অনুরাগের শতদল আমার মানস-সরোবরে বিকশিত হয়েছিল। সে যে বসন্তের প্রথম দান, যৌনরূপ, ভোগের সহায়। তাহাত

চিতানলে দগ্ধসাৎ হয়েছে। আমার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি কে করিবে? হে আমার জীবন-বসন্ত,হে আমার প্রথম কর্ম্ম প্রেরয়িতা, তুমি আমার ভোগকর্ম্মের অবসান করিলে, আমায় নূতন কর্ম্মে প্রেরণ কর। আমার ক্ষেত্রে নূতন রূপ ধারণ করিয়া অবতরণ কর।

কে যেন আস্‌ছে। আকাশে মেঘ নাই। আঁধারও কেটে গেছে। ঊষার আলোক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কার আলো? কে আস্‌ছে? ও কার চরণধ্বনি? ঐ ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হচ্ছে। চরণধ্বনি ক্রমেই কাছে আস্‌ছে। ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে। কোথাকার মৃদুমন্দ বায়ু-হিল্লোল, কার স্পর্শে শীতল হয়ে, আমার অঙ্গে এসে লাগ্‌ছে। এ যে আমার সকল মর্ম্মব্যাথা দূর করিল, সকল জ্বালার শান্তি আনিল। এ কাহার

স্পর্শ? মলয়ানিল স্পর্শ? হে আমার মলয় অনিল! তোমাকে আমি চাহি না। আমার মলয়রাজ কৈ? আমার প্রিয়তম কৈ? আমার অতিথি কৈ? আমার অতিথি আসে নাই। আমি ত অতিথির জন্য, কোন আয়োজন করি নাই। আমার অতিথিকে সম্ভাষণ করিতে ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়াই নাই। তাহার অর্ঘ্য ভরিয়া আনি নাই। আমার অতিথির পা ধুইবার জলও রাখি নাই। তাই কি আমার অতিথির আসা হইল না? মন আমার, এই বেলা আয়োজন কর, দরজা খোল, বাহিরে এসে দাঁড়াও। ঐ বুঝি আমার অতিথি এসেছে। আহা কি অপরূপ! এ কোন অতিথি? সেই আমার বসন্তরাজা, সেই আমার চিরপুরাতন নিত্য-নব-লীলাচর বঁধু! মন, তুমি একেই চেয়েছিলে? আমি,

একেই চেয়েছিলাম। আজ আমার রাজাকে সাদরে সম্ভাষণ করে, আমার হৃদয় ক্ষেত্রে যে সিংহাসন রেখেছি, তাহাতে বসাই। আজ আমার বসন্তরাজা আমার ক্ষেত্রে অবতরণ করেছে।

কৈ এত হৃদয়ক্ষেত্র নয়, এযে মুক্ত আকাশ! নূতন আকাশে নূতন মেঘে রং লেগেছে। এবার বসন্তের দান যে রূপ, সে যে আকাশের অমূর্ত্ত অনন্তমূর্ত্ত রূপ, সে যে বিশ্বরূপ। এ রূপ যে জগৎকে আলো দেবার জন্য। আর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে, ছায়ার উপাসনা করিও না। তোমায় যদি, এই অপার্থিব রূপ দিয়া, দেবতা বরণ করিয়া থাকেন, জানিও, তাহা দেবতার শান্তিজল। সে রূপ, কেবল মানবের দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিবার জন্য। এ বিশ্ব-

রূপে বাসনার লেশ মাত্র নাই। সে যে উচ্ছ্বসিত করুণা। যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে সহস্র রশ্মি বিম্বিত হয় কিন্তু সূর্য্য আকাশে এক, এরূপও তেমনি এক। কাহারও তাহাতে স্বত্ব নাই, স্বামিত্ব নাই, ভোগ দখল বাটোয়ারা করিবার অধিকার নাই। সে যে মুক্ত আকাশের সূর্য্য ও সূর্য্যের ন্যায় সকলেরই প্রকাশক। তবে হে দেব! আমায় সেই রূপ দিয়া বরণ কর, যাহা ভোগের স্পৃহনীয় না হয়ে কর্ম্মের সহায় হয়।

হে আমার ক্ষেত্রী। প্রথম আগমনে, তুমি আমার ভোগকায়া নির্ম্মাণ করেছিলে, তোমার দ্বিতীয় আগমনে, আমায় কর্ম্মশরীর দান করিলে, তুমি যে দধীচির ন্যায় দেহত্যাগে, আমার কর্ম্মশরীর প্রস্তুত করেছ। তুমি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, আমাকে

তোমার প্রতিনিধি রূপে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করছ।

সম্মুখে জীবনস্রোত গঙ্গার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে আবিলতা আছে, ফেনপুঞ্জ আছে, দগ্ধাবশেষ আছে, চিতাভস্ম আছে। কিন্তু স্রোতমাহাত্ম্যে সকলই পবিত্র, এই স্রোত যে কর্ম্মপ্রবাহ। ইহাতে স্নান না করিলে মুক্তি নাই।

হে আমার কর্ম্মদাতা, তোমাকে আমি কি করিয়া বরণ করিব, তুমি কেন নিজেকে আমার জন্য আমার জীবন পথে উৎসর্গ করিলে? উৎসর্গ করে নিষ্ফলতা পেলে? আমি ক্ষুধিত ছিলাম, না ভেবে চিন্তে তোমার দান গ্রহণ করিলাম। কর্ম্ম পেলাম, তৃপ্তি আসবে। তাহার পর জ্ঞানও আসবে, আনন্দও পাব। আমি স্বার্থপর হয়ে সব

ভোগ করলাম। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, পেলাম, কিন্তু তুমি কেবল উৎসর্গ করিলে। কিছুই চাও নাই? কিছুই পেলে না। কেবল আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করে ফিরে গেলে! তবে তাই যদি হয় ত আবার বিরহ। তা হলে শূন্যে ও পূর্ণে যে বিচ্ছেদ, ছায়ায় ও কায়ায় যে বিচ্ছেদ, ফলহীন বৃক্ষে ও পুষ্পিতা লতাতে যে বিচ্ছেদ, সেই অনন্ত বিচ্ছেদ তোমাতে আর আমাতে। সে যে দুঃখ, অনন্ত দুঃখ, অনন্ত হাহাকার।

না; তা আর হবে না। বিচ্ছেদ! তুমি যে এই অন্ধের আলো—আমার জ্ঞানের প্রকাশ। বিচ্ছেদ! আমা ছাড়া তুমি যে ছায়া মাত্র। আমিই তোমার আধার। তোমার জীবন, সে যে আমারই প্রেমে।

নিষ্ফলতা! তোমার কর্ম্ম ত আমারই কর্ম্মে। আমি যে তোমার কর্ম্ম শরীর। হে আমার কর্ম্ম প্রেরয়িতা! আমার ভিতর দিয়া, যে তোমারই স্বার্থকতা। তোমার উৎসর্গে তুমিই পূর্ণ হলে। এ দ্বিতীয় আগমন, কেবল আমার জন্য নয়। এ যে তোমার দ্বিতীয় জন্ম। তোমারই পূর্ণতার ও সার্থকতার নিমিত্ত। তুমি ধন্য হও।

চাঁদ।

এখানে, এই মুক্ত সমতল ক্ষেত্রে, ঐ আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদ, তোমায় আজ কয়দিন ধরে দেখ্‌ছি। তুমি প্রথম দিন একটি কলায় দেখা দিলে, পরে দিন দিন কলা পরিমাণে, নিজকে বর্দ্ধিত করে, দেখা দাও। তোমাকে প্রত্যহ দেখি। তুমি প্রতিদিন নূতন হয়ে দেখা দাও। তোমার নূতনত্ব, ঐ আকাশের কোলে বিশেষ স্থান অধিকারে, ও আকৃতির পরিবর্ত্তনে। তোমাকে দেখে মনে হয়, যেন তোমার চেষ্টা, তোমার উৎসাহ, কেবল ঐ আকাশে যে তোমার বিশেষ স্থান, তাহা অধিকার কর্‌বার উদ্দেশে। কবে, তুমি পূর্ণচন্দ্র হয়ে, আকাশে বিরাজ করিবে, ইহাই তোমার গতির লক্ষ্য। সেই

পূর্ণতাতেই, যেন তোমার পরিতৃপ্তি। কিন্তু যেদিন তুমি আকাশে পূর্ণচন্দ্র রূপে উদয় হ'লে, তখনই তোমার শুভ্র পূর্ণতা বিতরণ করলে। দিন দিন সেই প্রত্যেক দিনের পাওয়া কলা আবার নূতন লীলা করে দান করলে, এবং তারপর নিজেকে দিয়ে ফেলে, কোথায় লুকালে? বুঝি তোমার পাওয়ার আরম্ভই, তোমার জন্মের কারণ, তোমার পাওয়ার পরিতৃপ্তিতেই, তোমার দেওয়ার আরম্ভ, আর তোমার দেওয়ার শেষই, তোমার মৃত্যু। কিন্তু তোমার জন্ম মৃত্যুর অন্ত নাই। তুমি কতবার আস্‌ছ কতবার যাচ্ছ তাহাত কেও জানে না। কিন্তু তোমার একবার জন্ম ও মৃত্যুতে, যে কাল লাগে, সেই তোমার বিশেষ মূর্ত্তি,সেই তোমার কর্ম্ম। এই সময়ক্রম তোমার অতি আবশ্যকীয়, তোমার অন্তরঙ্গ।

এ ছাড়া, চাঁদ, তুমি যে পূর্ণচন্দ্র হ'তে পার না। তবে তার সংখ্যা ও ধারা কে জানে? সেই জন্মমৃত্যুর অনাদি পরম্পরা, যাহা কেও জানেনা, সেটা কি? সেটি যে তোমার প্রকাশ। তবে বলি, সেই তোমার জ্ঞান। এ জ্ঞান আমরা পাই নাই।

হে আমার তুমি, হে আমার আকাশের চাঁদ, তোমারও এই হৃদয়াকাশে জন্মমৃত্যুর সংখ্যা নাই। কিন্তু তোমার জ্ঞান ও আমার জ্ঞান যে অভিন্ন।

মনের দাবী।

মন আমার, তুমি কর্ম্ম চাও, তুমি তৃপ্তি চাও কিন্তু আজ যদি তুমি বুঝ্‌তে পার যে তোমার কর্ম্ম অল্পকালের মধ্যে শেষ হবে, এবং তোমার পূর্ণজ্ঞান আসবে, তাহলে কি তুমি সুখী হও! তুমি যা চাচ্ছ, তোমার কর্ম্মের অবসানে যে জ্ঞান চাচ্ছ, তা এখনই পেতে পার, এ জেনে, তুমি সুখই পাবে বুঝি; তুমি সুখ পাবে কি? মন, তুমি বল্‌ছ, না, এখনও না, এত শীঘ্র নয়। কেন নয়? কারণ কর্ম্ম শেষ কর্‌লেই হয় না, সময়ও চাই। আমার বেলা যে ফুরায় নাই। আর বীজ বপনের পর, অঙ্কুর জন্মাতে বা ধানের শীষ পাক্‌তে যে সময়াপেক্ষা, আমারও তাহাই। কর্ম্মের পরিণতি নিশ্চেষ্ট বা কর্ম্মহীন প্রতীয়মান

হলেও, কর্ম্মের উত্তমাঙ্গ। তবে মন, তুমি কেবল আধারে তৃপ্ত নও, তাহার সঙ্গে আবার সময়ক্রমও চাও। সেই সময়ের এখনও অবসান হয়নি বলে, জ্ঞান আস্‌তে চাইলেও তাকে তুমি ঠেলে ফেল্‌তে চাচ্ছ। তাই বলি মন, তোমার দাবী যে বড় বেশী। তুমি জ্ঞানকে সত্য সত্যই চাচ্ছ, কিন্তু এ সব না পেলেও আবার জ্ঞানকে গ্রহণ কর্‌বে না। তবে জ্ঞানের যদি আস্‌তে দেরী হয়, তাকে দোষ দিও না। তুমি আর সব না পেলে জ্ঞান নেবে না। তবে নিজের ইচ্ছায় নিজের সব ভার নাও। মন, তোমার এই নিজের ইচ্ছা, এটি বড় সোজা পাত্র নয়। সে তোমাকে আঁকা বাঁকা গলি ঘুঁজি এই সবের ভিতর দিয়া, তোমাকে নিয়ে, শেষে তোমার বাঞ্ছিত ধনের কাছে নিয়ে যাবে। নিশ্চিত

নিয়ে যাবে কি ? সে সোজাপথে চল্‌বে না। সোজাপথ জান্‌লেও চল্‌বেনা। এবং চল্‌বেনা বলেই, সময় আবশ্যক। কিন্তু এও তোমার বন্ধু মন, এও তোমার সহায়। কেবল তুমি যা চাচ্ছ, এবং এই নিজের ইচ্ছাটি তোমাকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তার খোঁজ রেখো। তা হলেই তুমি বাঞ্ছিতের কাছে যেতে পারবে। এটি জেন বাঞ্ছিত বস্তু এক, তাহার পথ অনেক। পথকে বাঞ্ছিত বস্তু বলে, ভুল করোনা। তোমার পথ কোন পথ, ও কোন দিকে, তাহা প্রথমে জান্‌তে হবে, তা না হলে পথকে, বাঞ্ছিত বস্তু বলে, ভুল কর্‌বে, বা পথের শেষে এসে দেখ্‌বে যে কেও কোথাও নাই। এসে, তোমায় নিরাশ হয়ে, ফিরে যেতে হবে। নিরাশা তোমার বিশ্বাসকে নষ্ট করবে। তখন তোমার নিজের

ইচ্ছাটি তোমায় দোষ দেবে। তোমাকে আর সম্মান কর্‌বে না। তুমি যদি নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে না চাও, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখ্‌তে চাও, তবে আগে পথটি ঠিক করে নাও। তোমার বাঞ্ছিত কোন পথে, কোন পথে যাবার শক্তি তোমার আছে, তাহা বুঝে নাও। তারপর নিজের ইচ্ছাটিকে স্বাধীনতা দিও। সেই পথে চল্‌তে চল্‌তে সে যদি একটু এদিক ওদিক্ তাকাতে চায়, একটু খেল্‌তে চায়, পথের পাশে বন জঙ্গলে ঢুকে, ঝোঁপের ভিতর কি আছে, দেখ্‌তে চায় তা তাকে দেখ্‌তে দিও। এ শিশুটাকেও এতটুকু তৃপ্তি দিও। তাতে একটু সময় লাগ্‌বে, লাগুক্, সময়ের ত আর অভাব নাই। এ সময়ক্ষেপ তোমার কোন লোকসান্ কর্‌বে না। বরং তোমার বাঞ্ছিতের কাছে যেতে

তোমার ভাণ্ডার নানা রকম দ্রব্যে পরিপূর্ণ হবে। তোমার বাঞ্ছিতের জন্য নানা রকম উপহার নিয়ে যাবে। আর যদিই দিশেহারা বা পথভ্রান্ত হও, আর অশেষ পথ চল্‌তে চল্‌তে নিরাশাই আসে, নিরাশা হতে অশক্তি, অশক্তি হ'তে মূর্চ্ছা ও তাহা হ'তে সম্ভবতঃ লোপ, তবে তুমি বিনষ্ট হবে। তাতে কারো কিছু লোক্‌সান হবে কি? কারো সৃষ্টি বিনষ্ট হবে কি?

পূজার অধিকার।

তাই বলি মন, তোমার অনেক দাবী। তুমি রসাস্বাদে তৃপ্তি চাও, তোমার আধার চাই। তুমি নিজের ইচ্ছাকে স্বাধীনতা দিতে চাও, তোমার সময়ের প্রয়োজন। তুমি নূতন নূতন লীলায় নিজেকে পূর্ণ করিতে চাও, সেই তোমার সময়ের পরিমাণ। সেই লীলাতেই তোমার সুখ, তোমার দুঃখ, সেই লীলাতেই তোমার চেতনা, তোমার জ্ঞান। এই সুখে ও দুঃখে তোমার সমান লাভ, তাই উভয়ই তোমার প্রার্থিত। তবে সুখ দুঃখ, এই দুই ভেদ না করে, বলি, যাহা তুমি চাও, যাহা তোমার প্রেয়।

তুমি এই প্রেয়কে চেয়েছ, এতে তোমার তৃপ্তি আসছে, কিন্তু এই তৃপ্তিতে তুমি কি

পেলে ? এই তৃপ্তিতে তোমার স্ফূর্ত্তি হচ্ছে, না অবসাদ আস্‌ছে, বিরাগ জন্মাচ্ছে। যদি অবসাদ আসে, সেই প্রেয়কে ত্যাগ কর, সে তোমাকে শ্রেয়ের পথে লইবে না। আর যদি স্ফূর্ত্তি আসে, প্রাণ সতেজ ও সরস হয়, তবে সেই প্রেয়ই, একদিন তোমার শ্রেয় হবে, কল্যাণকর হবে। প্রীতির সহিত তাহাকে, অন্তরে স্থাপন কর। তাকে ভক্তির চক্ষে দেখ, তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হও। পূজায় বাসনার অবসান কর। পূজাবসানে সাযুজ্য মিলিবে। তাহার পর, নিঃশ্রেয়স।

হে আমার লীলার সহচর ! যখন তুমি লীলা কর, তখন কেন অনেক সময় আমি নিজেকে দূরে রাখ্‌তে চাই। আমার মনে হয় ভোগ করলে সব ফুরিয়ে যাবে। তবে যে পাবার আশা, এই যে পেলাম পেলাম, এই

আশাটা আর থাক্‌বেনা। এই আশাটাই কি তবে আমার বড় ? আমি যেন পাবার আশাটারই বেশী ভক্ত। কিন্তু তাত নয়, যখন তুমি কাছে এসে তোমার মনোহরণ লীলা আরম্ভ কর, তখন ত আর নিজেকে সামাল করতে না পেরে, নিজের বিবস্ত্রতা ঢাকিবার জন্য ঝাঁপ দিয়া, আপনাকে তোমার লীলায় ডুবাই। এইরূপ অনেক বার নিজেকে ডুবাইয়াছি। কিন্তু তোমার অতল স্পর্শে ডুব দিয়া কখনও তল পাই নাই, কখনও আমার আশা মেটে নাই। কখনও অবসাদ আসে নাই। কিন্তু হে সখা, আজ তুমি সে মোহন মূর্ত্তিতে এসোনা, আজ আমি তোমা হ'তে একটু সরে দাঁড়াতে চাই। নিঃসঙ্গ না হলে পূজা কর্‌ব কেমন করে ?

আমি তোমার পূজারীর অধিকার চাই।

জগন্নাথ তীর্থে জগন্নাথের সেবার জন্য অনেক রকমের পাণ্ডা আছে। তার মধ্যে এক শ্রেণীর পাণ্ডা আছে যাদের শৃঙ্গারী পাণ্ডা বলে, তাদের কাজ কেবল জগন্নাথকে স্নান করান, কাপড় পড়ান, খাওয়ান ধোয়ান, এই সব। তারা জগন্নাথকে ছুঁতে পায় এই তাদের মহাগর্ব্ব। কিন্তু পূজারী পাণ্ডারা কেবল পূজা করে, তারা জগন্নাথকে ছুঁতে পায় না। শৃঙ্গারী পাণ্ডারা লোকের কাছে গর্ব্ব করে, "আমাদের সম্মান কি কম? আমরাই কেবল জগন্নাথের দেহ স্পর্শ করতে পারি" কিন্তু সত্য সত্যই কি তারা জগন্নাথকে ছুঁয়ে সব তৃপ্তির পরিতৃপ্তি যে আনন্দ তাহা পায়? সেই আনন্দ পায় না বলেই লোকের কাছে এই বড়াই। তাদের মনে সর্ব্বদাই পূজারী পাণ্ডা হইবার বাসনা থাকে।

পূজা না করলে আনন্দ পাবো কেমন করে? কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তিতে আনন্দ কখনও হতে পারে না। তবে ইন্দ্রিয়ের পাওয়া শেষ হলে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান দিয়ে, আমার তৃপ্তিদাতার পূজা করতে হবে। ভক্তিভরে, শ্রদ্ধালু হয়ে, শ্রেয়জ্ঞানে আত্মদানই পূজা, প্রেয়জ্ঞানে নয়। তবে নাথ! তোমাকে পূজা করতে দাও এবং পূজার শেষে যেন সাযুজ্য পাই।

হে আমার অন্তরের ধন! তবে এস, অন্তর হতে বাহিরে, আমার সম্মুখে দাঁড়াও। আজ তোমায় পূজা করি। হে প্রিয়, আজ তুমি আমার পরম অর্চনীয়। তুমি আমার পরম শ্রেয়। তুমি আগে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে দান করিয়া আমার অর্চনা করিয়াছিলে। তোমার টান আজ বুঝেছি। তবে

আমায় এখন অর্চ্চনা করিতে দাও। এখন আমার উৎসর্গের পালা। এই দান যজ্ঞে মন যেন কেবল পেলাম না পেলাম না করে, শোক না করে, যেন সে পূজায় আত্মদানের আনন্দ পায়।

পূজায় বিঘ্ন।

আমার পূজা হ'ল না। হে বিশ্বরূপ, তোমায় আবাহন করিলাম। তুমি অক্ষয় যৌবন লইয়া অবতরণ করিলে যাহাতে ভোগের গন্ধ-স্পর্শ নাই। কিন্তু রূপ-পূজায় বাসনার অবসান কোথায়? কামনা শূন্যের কামনা, আমায় মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করিল।

হে নিরঞ্জন, তুমিই আমার প্রাণবল্লভের রূপ ধারণ করিয়া আমার পূজায় বিঘ্ন সাধিলে!

বুঝিলাম, রাগের প্রতি রাগ, নিষ্কাম হইলেও, কামেরই প্রচ্ছন্নরূপ। বুঝিলাম, সুন্দরের উপাসনা, সুখময়ের আবেশ, আহুতিতে ঘৃত, দেবতার শান্তিজল নহে। বুঝিলাম যাহারা মুক্তির জন্য, সুন্দরের উপাসনা করে, তাহারা বিকার মুক্ত হয়ে, নিরাময়

হ'য়ে, নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ দর্শন পায় না। বুঝিলাম, যে অসুন্দরকে ভাল বাসিল না; যে দুঃখময়ের সেবা করে নাই, তাহার ভালবাসা, তাহার সেবা, তৃষ্ণারই নামান্তর। সেবা নহে, ভোগের বিলাস!

আমার বাসনা বহ্নি, প্রাণের আগুণ নিবিল না। এযে তৃষ্ণার প্রতি তৃষ্ণা, দুরন্ত কঠোর, জ্বালাময়। এই তৃষ্ণার প্রতি তৃষ্ণাই চরম বিকার। আজ অন্ধ কর্ত্তৃত্বের বোঝা স্কন্ধে লইয়া, মরীচিকার ছলনায়, তৃষ্ণার তাড়নায়, কোন ধূসর অশেষ পথে চলিতেছি। মরুভূমিতে মুমূর্ষু উষ্ট্রের ন্যায় পদে পদে স্খলিত-পদ ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। প্রজ্বলিত তৃষ্ণার বিকারে স্বপ্ন দেখি—সম্মুখে অমৃত সাগর। একি অমৃত না গরল? হে তৃষ্ণা-নিবারণ, হে দেব, তোমার সেই দুঃখময় মূর্ত্তিতে

আমার নিকট প্রকাশিত হও, যাহাতে আমার সুখ-তৃষ্ণা, রূপ-তৃষ্ণা নির্ব্বাপিত হয়! যেন তোমার দুঃখময় বিধাতৃ মূর্ত্তি ধ্যানে বিশ্বের সহিত এক যোগে যুক্ত হই। বিশ্বের পথে এই মরীচীকা বিলাস অতিক্রম করিয়া, এই মনোময় রাজ্যের ভোক্তৃত্ব-কর্ত্তৃত্ব-গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে যেন নির্ব্বিকার নিরাময় নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ পাই।

পূজার আসন।

কে তুমি? বল্‌ছ, তুমি আছ।

এ ঘোর আঁধারে কার নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়ে? কিন্তু কৈ, হাত বাড়ালে ত পাইনা। আমি যেতে যেতে সে যে সরে যায়। আমি কেবল আঁধার হাতড়াইতে থাকি।

আমি আর তুমি, তবে মধ্যে এ বৈষম্যের ব্যবধান কেন? পর্ব্বতে ও উপত্যকায় যে ব্যবধান, পতঙ্গে ও বহ্নিতে যে ব্যবধান, জীবনে ও মরণে যে ব্যবধান, সেই ব্যবধান আজ তোমাতে আর আমাতে।

আমি আজ চলৎশক্তি রহিত। এ ব্যব-ধান কাটাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি আজ অন্ধতামিস্রে পড়িয়া, আর তুমি কোন সত্যলোকে, কোন তপোলোকে, কোন ব্রহ্ম

লোকে। হে ধ্রুব! আমি শুধু তোমার জন্য আকাশের দিকে শূন্য মার্গে চেয়ে, বসে থাক্‌ব। আজ আমি তোমার আশায় বসে থাক্‌ব, যদি তুমি নেমে আস।

হে দেব, তুমি কি আমার পূজা গ্রহণ কর্‌বে? আমার যে ধূলার অঞ্জলি। এ মুষ্টিতে পূজার অর্ঘ্যও যে ধূলা হয়ে যায়। আমার সকল সন্তাপ, সকল দুঃখ, সকল বোঝা তোমার উদ্দেশে অর্পণ করিলাম। এই আমার কর্ম্মার্পণ, এই আমার ব্রহ্মার্পণ। আমার পূজার যে অন্য উপকরণ নাই। তুমি কি অবতীর্ণ হ'য়ে আমার দুর্ব্বলতার ভার, আমার শোক-ভয়ের জঞ্জাল, আমার লজ্জার ডালি, মাথায় করে বহন করবে? আমার জন্য, নিষ্কল দেবের দেবত্ব ঘুচে যাবে?

তবে এ অশ্রুজল কেন? কোথা হ'তে

বর্ষিত হল ? দেবতার অশ্রু ? আমার নয়ন জল। এ যে প্রাণারাম। হে আমার পূজ্য, হে আমার দেবতা, তুমি কি অশ্রুতে বিগলিত হয়ে আমার হৃদয় মন্দিরে অবতরণ করিলে। তাই বুঝি আমি ক্ষান্ত শান্ত হয়েছি। ঢাল দেব! ঢাল, তোমার শান্তি জল।

হে আমার আরাধ্য, হে আমার আশ্রয়, হে আমার অধিষ্ঠান, আজ আমি তোমাকে আমার দুঃখের আগারে প্রতিষ্ঠিত করি, সেখানে অশ্রুজলে, তোমার পূজা করি। আমার যেন একদিন বাসনা বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। যেন আমার সকল মলিনতা সেই অশ্রুজলে ধৌত হয়। নিষ্কল পবিত্র হয়ে, তোমার পূজার অধিকার কোথায় পাব ? এই ধূলাই আমার পূজার আসন হউক।

দুঃখময়।

হে আমার আকাশের চাঁদ, তোমার এ আসা যাওয়া কেন? তোমার একবার জন্ম মৃত্যুর অবসানে তুমি তোমার প্রকাশের সার্থকতা উপভোগ করেছ। তোমার কর্ম্মের সফলতা পেয়েছ। তুমিত পূর্ণচন্দ্র রূপে বিরাজ করেছ। পরে সেই পূর্ণতা, সেই ষোল কলায় পূর্ণরূপ, নাশ করে অরূপের আশ্রয় পেয়েছ। তবে তোমার এ পুনরাগমন কেন? পুনঃ প্রকাশ কেন? মরণান্তে জীবন কেন? পুরাণ পথে ঘুরিতে এত সাধ? নিষ্ফলতাতে এত আসক্তি?

আমি যেন যাই আসি। আমি যেন পুরাণ পথে ঘুরি। তোমার পথে ত তুমি একা। আর চাঁদ কি তোমার রাজ্যে আছে?

তোমার রাজ্যে কি চাঁদ চাঁদের লোভে লোভে ঘোরে? আমি একা নয়। আমি যে আমার সৃষ্টির সহিত জড়িত। তোমার কি সৃষ্টি আছে? আমি যদি চির জন্মের মত অরূপের আশ্রয় লই, তাহলে ত আমার সৃষ্টি, আমার বিশ্ব, থাকে না। তবে যে মহাপ্রলয়ের সূচনা হয়। তাই আমার এই যাওয়া আসা। তাই আমি ক্ষান্ত হতে পারি না। তাই আমি বিলুপ্ত হতে অসমর্থ। সৃষ্টি আমার প্রকাশ চায়। আমার প্রকাশ না হ'লে ত, তার গতি মুক্তি নাই। এই সৃষ্টির আকর্ষণেই আমার পুনর্জন্ম।

আত্মার দ্বন্দ্ব (*affinity*) যে এক নহে। অনন্ত মূর্ত্ত বিশ্বরূপই আত্ম চৈতন্যের দ্বন্দ্ব (*affinity*) একেত মুক্তি নাই। রূপে রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়াই জীবন। অংশে

অংশে, জীবে জীবে মুক্তিই মুক্তি। এই যে বহু হইবার সঙ্কল্প, এই অংশে অংশে পূর্ণ হইবার বাসনা, এ আমার কোন সাধনার পরিণাম। কোন পুণ্যের ফল? কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত? এ যে মহাচক্র। এ কালচক্রের বহির্ভূত কি করে হব? ইহাই জন্ম মৃত্যুর ঘোর। তাই আলো আঁধার মোহ জাগরণ। তাই পাইবামাত্র হারাই। ভোগ মুহূর্ত্তেই অরুচি। প্রণয় ডোর দিয়া বাঁধি আর ছিঁড়িয়া যায়। ইহাই আমার চির অভিশাপ। ইহাই বাসনার রূপ, রূপের বাসনা। ইহাই দুঃখ বীজ। ইহাই দুঃখ।

হে আমার আকাশের চাঁদ, আকাশে কি দুঃখের ছায়া আছে? এই দুঃখময়ের সহিত কি তোমার কখনও পরিচয় হয়েছে? রূপের অভাবে কি সেখানে কেহ পথভ্রান্ত হয়?

তাই যদি না হয়, তবে তোমার এ আবর্ত্তন কেন ?

এ মর্ত্তরাজ্যের পন্থা কিন্তু ভিন্ন। বাসনার রূপ, রূপের বাসনাই সৃষ্টির সূত্র-বন্ধ। এই বাসনাই দুঃখ। এই বাসনাতেই জন্ম, আর জন্মই ভগবানের অবতরণ। দুঃখই তাঁহার প্রকাশের কারণ। দুঃখই তাঁহার প্রকাশ।

হে আমার দুঃখময় প্রাণপতি! আমি তোমার অজানিত নই। তুমি ও আমার চিরপরিচিত। হে আমার জন্ম জন্মান্তরের, যুগ যুগান্তরের সখা! তোমার ও আমার সৃষ্টি এককালীন। তবে কোন মায়ার ফাঁদে, কোন ছলনায়, তোমায় আমায় এ বিচ্ছেদ।

না,—মিলনের অকাল নিদ্রাতে যখন মগ্ন থাকি, হে দুঃখময়, সে যে নির্গুণ ব্রহ্ম,

অজ্ঞানের প্রশান্ত সাগর। নিদ্রাভঙ্গেই যত চঞ্চলতা, যত অশান্তি। তাই এই জন্ম মৃত্যু, এই আনাগোনা, এই সৃষ্টি। তাই আজ এ অশ্রুজল এ বুক ভরা বেদনা। বিচ্ছেদেই দুঃখময়ের সৃষ্টি। তবে হে আমার দুঃখময় প্রাণপতি! তোমার বিরহেই তোমার জন্ম, তোমার প্রকাশ। তোমার বিরহেই তোমার রূপ দেখিতে পাই, তোমার দান বুঝিতে পারি। বিরহ না ঘটিলে, কি প্রেমের মর্ম্ম কেহ বোঝে? অভাবেই কি প্রেমের সার্থকতা? তাই বিধাতা ও দুঃখময়? ইহাই দুঃখময় বিধাতার চিরন্তন বিধান? এই দুঃখময়ই কি জীবন মরণের সন্ধিস্থল?

তবে হে স্বামিন্, হে প্রভো, তোমার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় আশ্রয় লইবার আগে তোমাকে একবার অংশে অংশে দেখে নিই।

তোমার পরিণীতা হবার পূর্ব্বে তোমাকে জ্ঞানে পেয়ে নিই। একবার আমাকে অস্থি চর্ম্ম সার করে, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সতীকে যেমন মহাদেব করেছিলেন, তেমনি করে, জীবে জীবে, রূপে রূপে, বিলাইয়া দাও। যেন জীবে জীবে, হে দুঃখময়, তোমারই দুঃখ, বেদনা, হাহাকার অনুভব করি। ও একদিন তাহাতেই তোমার সহিত চিরযুক্ত হই।

হে আমার সারাৎসার! তুমিই আমার দ্বন্দ্ব,—জীবন ও মরণের, জ্ঞান ও অজ্ঞানের কাল ও অকালের মধ্যে, তুমিই যোজক, তুমিই সোপান। তুমি আমার মোহ, তুমি আমার জাগরণ। তোমার মর্ম্মঘাতী স্পর্শে আমি জীবন্মুক্ত, আর তোমারই সর্ব্বজ্বালান্তক আলিঙ্গনে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হই। তোমার

সহবাসেই জীবন মরণের পার্থক্য •বুঝিয়াছি। তোমার নিমিত্তই আমার আকাশ দুই ভাগে বিভক্ত, কখনও পূর্ব্বাকাশ, কখনও পশ্চিমাকাশ, কখনও উত্তরায়ণ কখনও দক্ষিণায়ন। তোমার প্রভাবেই নূতনের পরিচয়, তোমার প্রভাবেই চির পুরাতনের আশ্রয়। তুমি এই দুইএর মাঝে শয়ান। তুমি আমার এপার ওপারের ব্যবধান, এক ধূসর মহাসাগর, আর আমি সেই সাগরে, তরণী। এপারে ঐ রঙ্ ও রূপের ছটা, ও কার সঞ্জীবনী মূর্ত্তি? ও পারে ঘন আঁধার, অ-কাল গ্রস্তের আবাস। মধ্যে তুমি? না আমারই ছায়া? আমারই প্রতিরূপ? এ মধ্য সাগর কেন? এ তোমার রাজ্য! তোমার সৃষ্টি! তুমি কে?

এস আজ প্রিয় সখা, আমার দুঃখময় প্রাণপতি, এস আমার সর্ব্বাঙ্গ; সর্ব্বান্তঃকরণ,

সর্ব্বাত্মা, তোমার ঐ মেঘবরণ রূপে আচ্ছন্ন কর। এস প্রিয়, তোমার বাহুপাশ প্রসারিত কর, আমার কোমল বক্ষ তোমার অস্থিসার বাহুপাশে বেষ্টন কর। তোমার বেষ্টনে যেন বিরহ বাসনা আজ চিরদিনের তরে দুরাশার ন্যায় অন্তর্হিত হয়। মরণ ও অ-মরণের দুই হৃদয় আজ এক হউক, দুই হৃদয়ের আঘাত আজ এক সুরে বাজিতে থাকুক। তোমার নয়ন দিয়া, তোমার সেই সর্ব্বগ্রাসী আঁখি দিয়া, আমার চক্ষুর দৃষ্টি হরণ কর। আজ আমার সকল সুখ-আবরণ কেড়ে নিয়ে আমায় রিক্ত কর। সকল শক্তি-আভরণ ভেঙ্গে দিয়ে আত্মায় নিরাময় কর! হে প্রভু, হে স্বামিন্, তোমার সেই শীতল স্পর্শ যেন আমার প্রতি অঙ্গে প্রতি মর্ম্মে, প্রতি পেশীতে, প্রতি স্নায়ুতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে,

রক্ত প্রবাহের অণু পরমাণুতে, বিদ্যুত রেখার ন্যায় বিচ্ছুরিত হয়ে, চিরনিদ্রার শান্তিতে অভিভূত করে। যেন হৃদয়ের স্পন্দন সেই স্পর্শে স্তিমিত স্তব্ধ হয়ে যায়। আমার সকল বাসনা বহ্নি, প্রাণের আগুন, আজ তোমার পরশে নির্ব্বাপিত হউক। তুমি নির্ব্বাণ সুধা ঢাল। আজ প্রাণ ভরে তোমার সুধা রস পিয়াও। তোমার সুধা রস পান করিতে করিতে যেন অঘোর নিদ্রাতে অ-স্বপ্নসাগরে মগ্ন হই।

চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছে প্রকৃতি নটীর রঙ্গমঞ্চের আলোক আজ চিরদিনের তরে নিবে যাচ্ছে। আমার জগৎ ও জীব সমূহ, সেই রূপ সমষ্টি, রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য, আঁধারে স্বপনের ন্যায় ভেসে গেল। হে দুঃখময়, সুখ যেমন তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হলে, তোমার

আশায়, তোমার স্বপনের মোহে, বিভোর হয়ে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, হে আমার জীবন মরণাতীত প্রভু! তুমিও তেমনি, আমায় নিয়ে, নিজক্রোড়ে আমায় আশ্রিত করে, তোমারই অতল-স্পর্শে অ-স্বপন-সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত হও।

মধ্যলীলা

(বিশ্বের পথে)

দেওয়ার কথা।

সে আজ যেন কত দিনের কথা। যেন এক মৃত্যুর ব্যবধান সে কাল ও এ কালের মধ্যে।

আমার প্রথম পাওয়ায়, ভোগের অবসানে, দিক-নির্ণয় হয়েছিল, দ্বিতীয় বার পেয়ে কর্ম্ম কি তা বুঝেছি। কর্ম্ম বোঝার পর যদি পাওয়ার কথা ভুলে, পাবার আশা না রেখে কর্ম্ম করতে পারি, তবেই তৃপ্তি, আর তবেই জ্ঞানও একদিন আসবে। কর্ম্মের পথে চলতে চলতে যা পাব তা গ্রহণ করব। যদি বসন্ত আবার এসে কিছু দেয়, তাহা বসন্তের দান বলে মাথা পেতে নেব। বসন্তের পথ চেয়ে আর বসে থাকব না। যদি কেহ কিছু দেয়, অযাচিত যদি কিছু পাই,

তাহা সব লোহার সিন্দুকে, আপাততঃ বন্ধ করে রাখবো। তবে পাবার জন্য এখন আর কর্ম্ম নয়, দেবার জন্য কর্ম্ম। হে বসন্ত, তুমি এখন আমার জন্য নও। আর আমার সহ-চরেরা তোমরাও আমার জন্য নও, আমি এখন তোমাদের জন্য। তবে ফুল, তোমাকেও কি আমি এখন ত্যাগ করবো? তুমি আর বসন্তের ফুল নও, পূজার নির্ম্মাল্য। এ যে ঝরা ফুল। তোমার রূপ আমি চাই না। তোমার গন্ধ থাকুক। এ আমার কর্ম্মের সহায়। এক জনকে যে রাখতে হবে তা না হলে একলা কি কর্ম্ম হয়? তোমাকে না হলে আমার দান কর্ম্ম হবে না। তুমি যে দেবতার দান, পূজার -নির্ম্মাল্য। তোমার সহায়েই বুঝিব আমারও দান করতে হবে।

আজ আমার পাওয়ার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। পাওয়ার কর্ম্ম ছিল বড় কঠিন। তাহাতে অনেক অশান্তি, হাহাকার, দুঃখ। সে যেন এক অশেষ মৃত্যুপথ, সেথায় কত মৃত আশার শব, কত উৎসাহের ভগ্ন হৃদয়, কত অনুরাগের জীর্ণ কঙ্কাল স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। এই মৃত্যু-পথ উত্তীর্ণ না হলে, এ পথে সুখ দুঃখের বাসনা বহ্নি নির্ব্বাপিত না করলে, দান কর্ম্মে অধিকার হয় না। আজ আমার সে পথে চলা শেষ হয়েছে। পথ শ্রান্তি দূর হয়েছে। আজ সে কর্ম্ম, অবসান করে নূতন কর্ম্ম পেয়েছি, দান কর্ম্ম পেয়েছি।

মন, তুমি এখনও কষ্ট পাচ্ছ। তোমার ভাণ্ডার দান করতে করতে খালি হবে বলে কষ্ট পাচ্ছ। মন, তুমি রিক্ত হ'তে সঙ্কুচিত হচ্ছ। তুমি আবার পাবে। দেখবে, তোমাকে

দিতে আরও কত জন এগিয়ে আস্‌বে। প্রকৃতি তার ভাণ্ডার খুলবে। তোমার ভাণ্ডার তখন বিশ্বের হীরা মণি মুক্তায় বোঝাই হবে। তুমিও বেশ নিতে জান, মন! আচ্ছা, তখন আঁধার ভরে নিও।

মন, তোমার পাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও। আমি যে আজ দেওয়া পাওয়ার রাজ্য অতিক্রম করে এসেছি। এখানে কেবল দান। সেই দানের কথা শোন।

দান তিন প্রকার। প্রথম দান সৃষ্টি, দ্বিতীয় দান পালন, তৃতীয় সংহার যাহাকে লয় প্রাপ্তি বলে। ইহাই দানের সনাতন প্রথা। কে এই দান প্রবর্ত্তিত করিল? আদিতে পুরুষ যজ্ঞে আদি পুরুষ এই তিন প্রকার দান করেছিলেন। তদবধি এই দান ত্রয়েই বিশ্ব যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। কিন্তু জীব

বুদ্ধি এ যজ্ঞের অধিকারী নহে। সেই পুরুষ প্রেরণা এই যজ্ঞের হোতা ও যজমান, একাধারে দুই। বিশ্বাত্মার বিশ্বজ্ঞানে যুক্ত হয়ে, জীবকে এই যজ্ঞ সম্পাদন করতে হয়। হে জীব, সৃষ্টি দানে তুমি আত্মা-প্রকৃতির, পালন দানে বিশ্ব-মাতৃকার, ও সংহার দানে মা আনন্দময়ীর ধ্যান করিবে।

শেষ দান, সংহার দান বড় নিষ্ঠুর বলে বোধ হয়। কিন্তু ইহাই শ্রেষ্ঠ দান। দানের উত্তমাঙ্গ। যে দানের বলে, জীব পাশ মুক্ত হয়, ইহা সেই দান। ইহার বলে আমি নিজের জায়গায় ফিরিতে পারি। যেথায়, আমার ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ কাল জ্ঞান, অসীম জ্ঞানের অ-কালে পর্য্যবসিত হয়। যে মহা শক্তিতে আমার উৎপত্তি ও গতি, আর যাহারই আকর্ষণে আমি পথ ভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের ন্যায়

যুগে যুগে, সেই মহা কেন্দ্রের পরিচয় পেয়েছি, ইহা সেই শক্তির শেষ ও পূর্ণ আকর্ষণ। যে অচিন্ত্য শক্তির প্রেরণায়, নিজের সৃষ্টি কর্ত্তাকে "সংহার" করে, সেই শক্তির জ্ঞানের বহির্ভূত হয়েছিলাম, ইহা সেই শক্তির প্রেরণায় পুনরাবর্ত্তন। সংহার দানের রহস্য এই যে, সৃষ্টিতে ও পালনে যেমন এক পক্ষের দান, অপর পক্ষের আদান, এখানে তেমন নয়, এ যে উভয় পক্ষেরই দান। একদিকে ভগবানের জীবকে, আত্ম-দান, অপর দিকে জীবের ভগবানকে, আত্ম-দান। আর এই পরস্পর আত্মদানে এক অখণ্ড দান লীলা সম্পন্ন হয়। তাই জীব স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, সংহার না চাহিলে স্বয়ং ভগবানও সংহার দানে অসমর্থ। জীবের পক্ষে, এ যে নিঃস্বের দান বা দান করে

নিঃস্ব হওয়া, যেখানে স্রষ্টাও তাহার সৃষ্টির কাছে হার মানে। এ ত্যাগ কি চরম ত্যাগ নয়? এ ত্যাগ যখন আমি সংহার কর্ত্তার পদে বসিব, তখনই বুঝিব, ইহা শেষদান, পরমার্থ ভাবে আত্মদান। তাই বলি, এ সংহার দান, নিষ্ঠুর নয়, বড়ই করুণ, বড়ই মধুর।

প্রথম দান।

দান আরম্ভ করে দেখি, প্রথমে আমার সৃষ্টি করতে হবে। আগে সৃষ্টি। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কিছু সৃষ্টি করতে হবে। আমি প্রকৃতি রূপে বর্ত্তমান। আমার প্রেরণা কৈ? একলা ত সৃষ্টি হবে না। আর নিজেকে উৎসর্গ করে, নিজের অংশে, যাহা সৃষ্টি করি নাই, তাহাকে পালন বা সংহার করিবার অধিকারও আমার নাই। তবে আমার দান কর্ম্ম কেমন করে হবে? কোন শক্তি, আমার অন্তরে, সৃষ্টির বীজ অর্পণ করবে? হায়! তবে বুঝি এ বিশ্বে আমার সৃষ্টি হ'ল না। শক্তি কৈ? প্রেরণা কৈ? তবে আমার ভাগ্যে সব শূন্য, তবে এইখানেই শেষ। আমার দান কর্ম্মের আরম্ভ হবে না? পালন

কর্‌বো কাকে ? অপরের স্থষ্টিকে ? আমার অধিকার কৈ ? নিজের স্থষ্টি না হলে, অপ-রের স্থষ্টির মাহাত্ম্য কি করে বুঝবো ? কি করে বুঝবো যে অপরের স্থষ্টিকে নিজের স্থষ্টির মতন পালন কর্‌ছি ? তার প্রমাণ কোথায় ? এসব কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যাওয়া, ত শুধু ধারণাতে হবে না। "মা", না হলে কে মায়ের প্রাণের ভালবাসা বোঝে ? অপরের ছেলেকে, আমি মনে করি, আমার ছেলের মতন ভালবাসি। কিন্তু তাহার প্রমাণ কৈ ? যে নারীর শিশুর ক্রন্দন ধ্বনিতে বক্ষ হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, সেই নারীই জননী হইবার যোগ্য। এই দুগ্ধক্ষরণই তাহার মাতৃত্বের নিদর্শন। সেই মাতাই, নিজের বাৎসল্য দিয়ে অপরের সন্তানের, অপরের স্থষ্টির মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন। এবং সেই

মাতাই, সৃষ্টিকর্ত্রীর পদ হইতে পালনকর্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। তিনি সৃষ্টিকে, অপত্য নির্ব্বিশেষে দেখিবেন, তাহার প্রমাণ সেই দুগ্ধ ক্ষরণ।

আমার সৃষ্টি করাও হলোনা, পালন করাও হবে না। তবে কি করে আমার দান আরম্ভ হবে?

*Virgin Mary*র সেই রূপকথার অর্থ কি? তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁর সেই সৃষ্টি যে পরকীয়া সৃষ্টি। তাঁহার সন্তান যে *son of man*, মানব সন্তান। সে সন্তানে তিনি বিশ্ব মানবের জননী ও পালয়িত্রী। প্রাকৃত মাতার প্রাকৃত সৃষ্টি স্বকীয়া সৃষ্টি, কিন্তু ভগবতী বিশ্ব-মাতৃকার সৃষ্টি যে পরকীয়া সৃষ্টি (*Vicarious motherhood*) প্রকৃতির সন্তানেই তিনি সন্তানবতী। তাই

Virgin Mary ও এই পরকীয়া সৃষ্টি বলেই, বিশ্ব-মাতৃকার পদে আরূঢ়া। তিনি যে বিশ্ব-মাতৃকার মাতৃশক্তির বিলাস।

কোন শক্তির বলে, কিসের প্রেরণায়, তাঁর এই সৃষ্টি। তিনি প্রেমময়ী, প্রেমরূপী প্রকৃতি। কোন শক্তি, তাঁহার পুরুষ ছিল? চিন্ময় জ্ঞানই, বুঝি, তাঁহার পুরুষ ছিল, এবং সেই জ্ঞানের প্রেরণায় তিনি সৃষ্টি করে-ছিলেন। যে জ্ঞানের সহায়ে, তিনি মানব সন্তানের জনয়িত্রী হইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান রসই কি দুগ্ধ রূপে বর্ষণ করেছিলেন? আর আজও তাই স্তন্য-দানে মাডোনা (*Madonna*) জগতের জননী, ও পালয়িত্রী। সেই পীযূষ পানে বর্দ্ধিত হয়ে আজও মানব সন্তান, মৃত্যু পাশ হইতে মুক্ত হয়?

আমি কোন শক্তির প্রেরণায় সৃষ্টি

কর্‌বো? সে চিন্ময় জ্ঞান আমার কৈ? তবে আমার জ্ঞানপথে দানও অসম্ভব। ইন্দ্রিয় পথ রুদ্ধ হ'লে কি জ্ঞানপথ ও রুদ্ধ হয়? এই কি বিশ্ব নীতি?

মন আমার, ক্ষান্ত হও! নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যাও। জীববুদ্ধি যে এ দান যজ্ঞের অধিকারী নয়। বিশ্বরূপী সৃষ্টিতে, আত্ম সৃষ্টি বোধ, আরোপ করে, তাহা পালন কর। পালন কর্‌তে কর্‌তে, বাৎসল্য রসই মূর্ত্তি ধারণ করবে, তাতে তোমার সৃষ্টি জ্ঞান আসবে। তখন বিশ্বরূপী সৃষ্টি তোমার জ্ঞান-রূপী অপত্য হয়ে দাঁড়াবে। তোমারই সৃষ্টি বলে বুঝতে পারবে। কেবল বিশ্বাস রাখ যে জ্ঞানে সৃষ্টি হয়, জ্ঞান যখন ধ্যানে পরিণত হয়। *Virgin Mary*ও তাহাই করেছিলেন, জ্ঞানেই, বিশ্বমানবের আরাধনা করেছিলেন।

আবার দেখ, মথুরায় জননী দেবকী, কিন্তু বৃন্দাবনে মা যশোদা! ভগবানের এ কোন রীতি? মন আমার, তুমিও বাৎসল্য রসে স্বকীয় ভাব ত্যাগ করে, পরকীয় ভাব অবলম্বন কর। তবেই তুমি বিশ্ব মাতৃকার মাতৃত্বের ভিতর দিয়া, বিশ্বস্রষ্ট্রী আদ্যা-প্রকৃতির সন্ধান পাইবে। পরে, যখন, মন, তোমার দেনা পাওনার হিসাব করিতে বসিবে, তখন সবই তোমার জ্ঞানে, তোমার সৃষ্টি, বলে জানবে। আর তখন তোমার সৃষ্টিরও সংখ্যা থাকবে না, ঐশ্বর্য্যেরও সীমা থাকবে না।

তবে এস, হে আমার প্রেরক, হে আমার চিন্ময়, হে আমার পুরুষ, তুমি আজ আমায় ছেড়োনা। হে নিত্য, হে সারাৎসার, তুমি আমায় জ্ঞান বীজ অর্পণ কর, যাহাতে আমি আদ্যা-প্রকৃতির সহিত স্রষ্টৃ-পদে আরূঢ় হই।

দ্বিতীয় দান।

আজ আমি পালনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত। আমার সৃষ্টি কৈ? আমার সৃষ্টি হয়েছে। সে যে জ্ঞানের সৃষ্টি। জ্ঞানই সৃষ্টিকর্ত্তা, আমার জ্ঞানও সেই জ্ঞানে। তবে মন আমার, সৃষ্টির রূপ চেয়োনা, ঐশ্বর্য্য চেয়োনা। এ দান যজ্ঞে, জ্ঞান কর্ত্তা, কিন্তু ভোক্তা নয়।

হে আমার আত্মা, তুমি আজ স্বরাট। বহির্জগৎ ও তোমার, অন্তর্জগৎ ও তোমার। সবই তোমার সৃষ্টি, তোমার স্বীকৃত। এতদিন কেবল নিজের রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ করলে, সকলকার সব কেড়ে নিয়ে, প্রকৃতির সম্পদ লুট করে, আত্মসাৎ করলে, জ্ঞান-

শক্তির প্রভাবে আত্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করলে।

জ্ঞান বলে, জীব মাত্র, অপূর্ণ মাত্র, আমারই অংশ, উৎসৃষ্ট অংশ, সৃষ্টি।

হৃদয় বলে, তাইত রক্তের টান, তাই আমার রক্ত দিয়া আমারই পঞ্জরের ন্যায়, কলিজার ন্যায়, পোষণ করি।

জ্ঞান— এই নিজের অংশকে নিজের রক্ত দিয়া পূরণ করাই পালন। অপূর্ণকে পূর্ণ কর্‌তে গিয়েই, পূর্ণতা পাওয়া যায়, তাই এই আত্ম-বিতরণ। হে আত্মা, এই বিতরণেই তোমার ভাণ্ডারের পূর্ণতা ও স্বার্থকতা। এ যে অক্ষয় ভাণ্ডার। এ যে অফুরন্ত বাড়ন্ত, কে বিতরণ করে শেষ কর্‌তে পারে? তুমি আজ স্বরাট্! তুমি অবাধে নিজের স্বরাজ্য দান করে, তোমার সৃষ্টিকে, পালন কর,

পূর্ণ কর, স্বেচ্ছায় পূর্ণতার আধান কর। হে আত্মা, তোমার পূর্ণতায়, সৃষ্টির পূর্ণতাও অবশ্যম্ভাবী।

হৃদয়—না, সৃষ্টিতে আত্মা স্বরাট্ হলেও পালনে, সে স্বতন্ত্রতা নাই। পালনে যে আমি পরতন্ত্র, যাহাকে পালন করি তাহার অপেক্ষা করিতে হয়। যে দান, আমার ঈপ্সিত তাহা দেয় নহে! দান যে গ্রহণ করে, তাহার যাহা প্রেয়, তাহার জীব লীলার যে ধারা, সেই পথেই শ্রেয়ের অনুসরণ করিতে হয়। মাতৃত্বের নিদর্শনে পালন কর্ম্ম বোঝা চাই। সন্তান, মাতার ক্রীড়ণক নয়, মাতার নিয়ামক। ভগবান জীবের নিয়ামক, কি জীব ভগবানের নিয়ামক, ইহার মীমাংসা কে করিবে? তুমি না আমি?

জ্ঞান—সত্য, কিন্তু এই মাতৃত্বেও ক্রম

আছে। যুগল সম্বন্ধ (*affinity*) যেমন অজ্ঞানে ও জ্ঞানে ত্বুবার করে পেতে হয়, সৃষ্টিতে যেমন স্বকীয়া হ'তে পরকীয়া পদবীতে উঠ্‌তে হয়; মায়ের বাৎসল্যকেও তেমনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মার্গ হ'তে নিবৃত্তি মার্গে নিয়ে যেতে হয়। প্রথমে যেমন পাখী তার ছানাকে ডানা দিয়ে ঢাকে ও ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়, তারপর চোখ ফুট্‌লে উড়্‌তে শেখায় ও সেই ডানার ঝাপটেই উড়িয়ে দেয়। অথবা মা যেমন সন্তানকে স্তন দান করেন ও স্তন ছাড়ান্। এই উড়ান ও ছাড়ানই মাতৃত্বে সন্ন্যাস। স্বভাবমুগ্ধ বাৎসল্যেও এই সন্ন্যাস প্রচ্ছন্ন ভাবে কাজ করে। মা ঘুমঘোরে শিশুকে স্তন দান করেন, কিন্তু স্তনের চাপ পড়ে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ না হয়, এই জ্ঞান তাঁর মনের অভ্যন্তরে

সদাই জাগে। তাই বলি, সন্ন্যাস সকল সিদ্ধির আগে।

হৃদয়—সিদ্ধির জন্যই সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের জন্য সিদ্ধি নহে। মা যদি আত্মদানে সন্তানের জৈবশক্তিকে খর্ব্ব করেন, নব জীবনের অবসর না দেন তাহলে পালনে ও সংহারে যে কোন ভেদ থাকে না। মা ভগবতী, প্রথমে এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সৃষ্টির মুখ চেয়ে পালন কর্ম্মে বিশ্বমাতৃকার আত্মদানের আনন্দ হ'তে তাঁর সেই মায়ের প্রাণকে বঞ্চিত করেছিলেন। নতুবা যে সৃষ্টিক্রমও থাকে না, পালনক্রমও থাকে না। একেবারেই সংহারের পালা। তাহাত সম্ভবপর নয়। এ সময়ক্রম যে জীবের অন্তরঙ্গ লীলা। হওয়াতে ও পাওয়াতেই যে পূর্ণতা, স্থিতিতে নয়। সেই অবধি সন্তান-

বৎসলা মাতা, পালন কর্ম্মে, এই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মা ভগবতী যেমন স্বষ্টি কর্ত্রী হয়েও, সাম্রাজ্ঞী হয়েও, সন্তানকে নিজের স্বত্ব, নিজের সাম্রাজ্য দিতে চাহিলেও নিজের শক্তি ধারণ করিয়া রাখেন। তিনিই শক্তি কিন্তু আজ তিনি অশক্ত। আজ সাম্রাজ্ঞী হয়েও তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি আজ ইচ্ছাময়ী নহেন, সন্তানের ইচ্ছাশক্তির কাছে তাঁহার ইচ্ছা পরাজিত। ইহাই মাতৃত্বে সন্ন্যাস। ইহাই ধাতৃত্ব, ইহাই পালন।

হে আমার মাতৃশক্তি, হে জগৎ ধাত্রী, জগৎ পালণী তবে তোমার সন্তানদের জীব লীলা কর্‌তে দাও। তাদের সুখ দাও, দুঃখ দাও, বাসনার অগ্নি জ্বালাও। সেই ধূসর আলোকে, ছায়ার ন্যায় তাড়িত হয়ে তারা যদি পথ ভ্রান্ত হয়, উল্কার ন্যায় ছট্‌কে যায়,

তাদের সে পথে ছুট্‌তে দিও। তবে তাদের শক্তি দিও, যেন মূর্চ্ছিত না হয়। তাদের বিশ্বাস দিও, যেন প্রাণের দ্রোহ না করে। আর সেই বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে তারা যেন তোমার টান সর্ব্বদা বুঝ্‌তে পারে। তোমার টান ছাড়া হয়ে যেন তোমার পরিধির বাহিরে না পড়ে। তাদের স্বাধীনতা দিয়ে নিজের পথ নিজের ইচ্ছায় খুঁজে নিতে দাও। তবে মাঝে মাঝে তোমার রাশের টান টেনো। একদিন মাগো, তাদের বাসনা অগ্নি নিবে যাবে। তখন মাগো, সেই শূন্য অম্বরে, তোমার সন্তানদের পথে, একটি বাতি রেখো। আঁধারে যেন পথ না হারায়। যারা তোমার অন্বে-ষণে প্রয়াণ করবে তাদের জন্য বাতি রেখো। যেন আলো ধরে, সেই গহন পথে, চলতে পারে। তামস আঁধারে, তোমার অন্বেষণে

যেন 'শূন্যের গহ্বরে, পতিত না হয়, অতলে তলাইয়া না যায়। আলো রেখে তুমি নীরবে প্রতীক্ষা করো। কেবল উপরে বসে আলো আঁধারের ওপার হতে, তোমার অপার হতে, তোমার সন্তানের উপর চোখ রেখো।

মা আনন্দময়ি, এই মহা প্রয়ানের পথে, অন্তিমে,তোমার দ্বারে যখন তোমার সৃষ্টি এসে উপস্থিত হবে, তুমি তোমার অন্তঃপুর হতে বাহিরে এসে দাঁড়াইও, দ্বার খুলো। তোমার অতিথি যে তোমার সন্তান। তোমার হারান সন্তানই, আজ চির প্রবাস হতে, ঘরে ফিরে এসেছে। তোমার পালিত পুত্রকে, শেষ দান করে, তোমার কর্ম্ম শেষ কর। তোমার সৃষ্টিকে,তোমার রহস্যাগারের ভিতরে লয়ে, মা আনন্দময়ি! তোমার শেষ মনোরথ পূর্ণ কর।

তৃতীয় দান।

হে অন্তিমের দ্বার রক্ষক, তোমার দ্বারে সকলকে একা একা আসতে হবে। তখন যে লীলা সাঙ্গ হ'বে। তখন আর "দুই" এর দরকার হবে না। কেবল লীলার জন্যই এক, দুই, বহু।

হে আত্মা, হে অন্তরতম, দেখ, তোমার দ্বারে আজ কত অতিথি আসছে। একে একে উপস্থিত হচ্ছে। এখন দ্বার খোল। নিজে, বহিঃসৃষ্টিকে নিজের ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। এখন মহাপ্রলয় আরম্ভ করে, কেবল নির্ব্বিকার হয়ে, কাজ কর। কারো, সুখ দুঃখের কথা ভেবো না, তুমি কেবল নীরব হয়ে তোমার কাজ কর, তোমার কাজ শেষ করে, পূর্ণ জ্ঞানের অরূপে, অকর্ম্মে বিহার কর।

না, তোমার জ্ঞানের অন্ত নাই, কর্ম্মেরও অন্ত থাকিবে না। জ্ঞান, কর্ম্ম কেবল মহাচক্রে চিরকাল ঘুরিতেছে। কর্ম্ম-শেষে, সবই এক, আবার কর্ম্মের জন্য দুই। এই, এক দুই, দুই এক, চিরকাল ঘুরিতেছে। কেও জান্‌ছে না, কখন এক, কখন দুই। কেও বল্‌ছে এক, কেও বল্‌ছে দুই। কর্ম্ম যেখানে সেখানেই দুই, জ্ঞান যেখানে সেখানেই এক।

হে অঘোর, হে শান্ত, হে আমার কূটস্থ! তোমার শেষ দানে যে মুক্তি, কেন তাতে জীবের অভিরুচি হয় না? তোমার অভয় দানে কেন সন্ত্রস্ত জীব অভয় পায় না? কেন তোমার সেই শান্ত মূর্ত্তি ধ্যানে শান্ত হয় না? কেন তোমার সেই সংহারিণী মূর্ত্তিতে রুদ্র মূর্ত্তি দেখে? কেন তোমার দ্বারে আসিয়া

বিরহ-বিচ্ছেদ ও মৃত্যু-নির্ব্বাণ-বিভীষিকায় মোহিত হয় ?

সে যে জেনে আসে নাই। ঐ যে বাতি রেখেছিলাম, তার সেই আলোক ভাল লেগেছিল, তাই আমার দ্বারে ভুলে এসেছিল। সে যে পতঙ্গ বৃত্তিতে এসেছে, নিজের ইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে আসে নাই। কেহ বা বিরাগের বশবর্ত্তী হয়ে এসেছে, সে যে অরাগের সন্ধান পায় নাই। তাহার কর্ম্মের অবসান হয় নাই। যাদের খেলা সাঙ্গ হয় নাই, লীলা ফুরায় নাই, যাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে নাই, যারা জ্ঞান পায় নাই, তারা আনন্দও পাবে না। তাদের বাসনাই তাদের সৃষ্টির মহাচক্রে ঘূর্ণিত কর্‌বে। সেখানে আমার শ্রেষ্ঠ দান, সংহার-দান ব্যর্থ হ'ল। আমি যে আমার আনন্দ

দানে, আত্মদানে, বঞ্চিত রহিলাম। সেই আমার দুঃখ।

তবে কি বিশ্বেশ্বরের যজ্ঞ হীনাঙ্গ হইল? তবে এই যে তোমার সৃষ্টি, তাহা তোমার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে?

হে আমার আত্মার আত্মা! তোমার সৃষ্টি ও সংহারের কি কোন ক্রম আছে? সেই মহাকালেরও পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ক্রম, সে ক্রম কে জানে? তুমিই কি সেই ক্রম? তুমিই এই অনাদ্যনন্ত-পরম্পরার সূত্রবন্ধ? তুমিই গ্রন্থি? তুমিই বন্ধন? তবে তোমার কি মুক্তি নাই।

অন্ত্য লীলা।

(বিশ্বাতীতের পথে)

(লীলার সহচর।—১)

প্রেমে উপেক্ষা।

হে আমার লীলার সহচর, আজ মনে হচ্ছে, আমার সব শেষ হয়েছে। আজ আর আমার আমি জ্ঞানে অভিরুচি নাই। আমার ডাক পড়েছে, এখন যেতে হবে। আমি তৃপ্ত হয়ে যাব। হে আমার লীলার সাথী, তোমায় কি কষ্ট দেব? তুমি আমার সহিত যেতে পারবে না? তোমার ডাক পড়ে নাই। তুমি কি তোমার "তুমি-জ্ঞানে" শ্রান্ত হও নাই? আমি কিন্তু আমার "আমি -জ্ঞানে" শ্রান্ত হয়েছি। আমার আমিত্বের শেষ হয়ে এসেছে। পরিপূর্ণ তৃপ্তি হতে আমার যে "আমি-আনন্দ" হতে পারে তা

পেয়েছি। তুমি যদি তোমার "তুমি-আনন্দ" না পেয়ে থাক, তবে আমি স্বেচ্ছায় অপেক্ষা করবো। তোমার তৃপ্তি না আসা পর্য্যন্ত তোমার লীলার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি তোমার প্রকৃতি সেজে, করুণায় নয়, অশ্রদ্ধায় নয়, তিতিক্ষায় ও উপেক্ষায় তোমার প্রকৃতি-নটী সেজে,—তোমার সম্মুখে লীলা করবো। তারপর যখন আমার এই খণ্ড লীলার শেষ হবে তখন ত আর আমি "আমি" হয়ে থাকবোনা,তখনও কি তুমি সেই অখণ্ড লীলার অধিকারী হবে না? হে আমার বঁধু, আমার মুক্তিতে কি তোমার মুক্তি নাই?

তাই বলি, তুমি যদি পরিপূর্ণ তৃপ্তি না পেয়ে থাক, তোমার লীলা যদি সাঙ্গ না হয়ে থাকে, তবে তুমি আমায় যেতে দিও না।

আমার হাত ধরে রাখ। তুমি আমায় না ধরিলে আমায় কিসে রাখ্‌বে? তোমার কর্ম্মই আমাকে রাখতে পারে। আমার কর্ম্ম নাই। সেই আমার সাক্ষী, সর্ব্বসাক্ষী, নির্ব্বিকার, আমায় ডেকেছে।

হে আমার লীলার সহচর, আজ তুমি আমার জন্য নও। আমি তোমাকে চাইনা। তুমি না আসলেও আমি আজ যেতে পার্‌বো, তোমাকে ছাড়া আজ আমার চল্‌বে। তোমার জন্য আজ আর আমি বসন্তের আরাধনা কর্‌বো না। নিজের জন্যও বসন্তের আরাধনা কর্‌বো না। আজ আমি যে আত্ম যোগ পেয়েছি। তোমরা পাও নাই। তোমরা কেবল আমার শুক্‌না ঝরা ফুলের গন্ধ পেয়ে, আমার অনুসন্ধানে এসেছ। আমি নাই দেখে ফিরে চলে যাচ্ছ! এখন

আর আমাকে "আমি" বলে চেওনা। তোমরা এখন বসন্তের আরাধনা কর। আমাকে চাইলে বসন্তকে পাবে না। বসন্তকে চাইলে আমাকে পাবে। আমাকে না পেয়ে বিশ্বাস হারাইও না। কেবল বসন্তের আরাধনা কর। এবং বসন্ত যদি আসে, তোমার ক্ষেত্রে যদি বসন্ত রাজা অবতরণ করেন, তবে আমাকেও পাবে। আমিও সেখানে থাক্‌বো। তুমি চিন্‌তে পারবে ত ?

পাখী যবে তরুশাখে আপন কুলায়,
নিশ্চিন্তে বসিয়া সেথা করে কলরব
হেলায়ে দুলায়ে শাখা সমীরণ বহে
বিহগের মনে থাকে ডানার গরব।

বাঁধে তারে পল্লবের কায়া সুকোমল,
তথাপি ভোলে না পাখী বাসার নির্ম্মাণে,
স্বভাব কৌশলে, সে যে স্বাধীন প্রবল,
শূন্যের আশ্রয় আশে পল্লব পতনে।

সেই মত মুক্ত প্রাণে প্রেমিক সাজিয়ে,
লীলাতে মেতেছি আজ মোর বঁধু সনে।
জানে প্রেম, শূন্য পথে পক্ষ প্রসারিয়ে
লীন হবে মুক্তাকাশে, লীলা সম্বরণে।

(লীলার সহচর।—২)

সম্বুদ্ধের লীলা।

হে আমার লীলার সহচর, আমি তোমার কাছে হার মেনেছি। ঐ যে তুমি আবার আমায় ডাক্‌ছ। তুমি এখনও বড় লীলার ভক্ত, আমি ত আর লীলার ভক্ত নই। তবে তোমার জন্য যখন যেতে পারিনি, তখন সেই সম্বোধি লীলা করে, তোমায় রস প্রদান করি। আর তুমিও আমায়, তোমার তৃপ্তি বুঝ্‌তে দাও। তোমার তৃপ্তি বুঝে আমি নূতন লীলা করি, যাতে, তোমার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও তাহা হতে যে অসঙ্গ, তাহা যেন শীঘ্র আসে।

আর আমি? আমি ত আর লীলার ভক্ত

নই, লীলাতে ত আমার সাধ নাই, তবে সে লীলা করি কেন? এ যে অহৈতুকী লীলা। মুক্তি দান তরে? যে দানে আমার বন্ধন, সে দান করি কেন? আমি এখানে আত্ম ত্যাগ করি। তবে এ ক্ষেত্রে এই আত্ম ত্যাগই আমার প্রেয়। কারণ ইহাত শ্রেয় হতে পারে না, কল্যাণকর হতে পারে না। কল্যাণে আত্মার কোন অপচয় হয় না। আত্মার উপচয় হয়।

মন, এ যে তোমার দেনা পাওনার কষ্টি পাথরে, আত্মার মুল্য যাচাই কর্‌লে। আত্মার যে আজ এই লাভালাভ গণনা শেষ হয়েছে। আত্মার পক্ষে, আজ এই তোমার বন্ধন ভয়ও বন্ধন, মুক্তি বাসনাও বাসনা। যতদিন স্বতন্ত্রত্ব থাকে, জীববুদ্ধিতে কর্ত্তৃ বোধ থাকে, ততদিন এই ভয়, এই বাসনা,

কর্ম্মের সহায়, মুক্তি পথে, পথ প্রদর্শক। পরে যখন আত্মার কেন্দ্র হারাইয়া যায়, পরিধিও থাকে না, তখন অরূপ অবাধ আত্ম প্রকাশই সার, আর এই আত্ম প্রকাশই আত্ম দান। এ দানে অলাভও যেমন অসম্ভব, লাভও তেমনি অলীক। সে যে আত্মকাম, আত্মরতি। সে যে সর্ব্বকাম, সর্ব্বভুক।

কেগো হেথা বর্ত্তমান ঘন অন্ধকারে
ভ্রান্তি বশে সুপ্তিমগ্ন মহাপ্রাণ কোন্,
চমকিছে রঙ্গে ভঙ্গে চিত্তে অনুক্ষণ,
বিজলীর চক্ররেখা যেমতি আঁধারে।
কাতর হয়েছে যেন মুক্তি-দান তরে,
নিদ্রা ভঙ্গে হেরি জীবে মৃত্যুপাশে ধৃত,
তেজের আভাসস্পর্শে করি সচকিত
পিয়ায় অমৃত রস জীবে অকাতরে।
অকাতরে, কিন্তু তার নাহি কোন সাধ;
নাহি সাধ, নাহি মানা সমীপে তাহার,

তৃপ্তি বোধ নাহি তার, নাহি অবসাদ,
ভক্ত, সে যে নয়, আর ভবের লীলায়।
কর্ম্মশূন্য, জ্ঞান, পূর্ণ, অরূপ, অবাধ,
জীবে জীবে সাক্ষী সে যে, মুক্তির সঞ্চার।

(লীলার সহচর—৩।)

মনের আফ্‌সোস।

মন আমার, এই লীলা আর করবে? মন বল্‌ছে কর্‌বো। আমি জানি, তুমি করবে। তাহলে আবার দুঃখ কর কেন?

দান করবার সময়, মন যে জান্‌তোনা। আমি ত এ দান করেছি। তখন মনকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু সুখ দুঃখটা মন যে বখ্‌রা করে নিতে চায়। লীলার শেষে, আমার মন বুঝতে পার্‌লে, যে আমার সহচরের তৃপ্তি, আমার "আমি আনন্দের" বহিরাংশ, ভিতরের নয়। আমার মন, যে আমার লীলার সহচরকে, আমার ভিতরে আন্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু যখন দেখ্‌লে, যে সে

তৃপ্তি পেয়ে ফিরে গেল, তার সব সাধ মিটিল, তখন আমার মন হায় হায় কর্‌লো। আমার লীলার সহচর, যে আমার মধ্যে এসে স্থান পেলো না। সে যে আমার আলোকে এসে ছিল, আমার আঁধারে আসে নাই। অংশ হয়ে এলে ত চল্‌বেনা। তাহলে ত আমার আনন্দকে ঢাক্‌তে পারবে না। এতে আমার মনের মন উঠে না। অংশ কি কখনও সমগ্রকে পূরণ করতে পারে? তাই কষ্ট। তবে অংশ না হয়ে, যদি সমগ্র হয়ে আসে, তা হলে হয়। আমার মন, আমার লীলার সহচরকে, ঠিক আমার সমান করে পেতে চেয়েছিল। তা হ'লো না। আমার সখা, আমার মনের মর্ম্ম বুঝিল না। এই আমার মনের আফ্‌সোস।

মন, পাবার আশা ছেড়ে, তোমাকেও দান

করতে হবে। সখাকে, সমান করে নিয়ে তোমার মধ্যে ফেলতে হ'লে, তোমাকে দান করে নিঃস্ব ও নিরাবরণ, হ'তে হবে। সেদিন তুমি অকিঞ্চন আনন্দের অধিকারী হবে। সেদিন সখা সমগ্র হয়ে, সমান হয়ে আসবে। তখন আর তোমার দুঃখ থাকবেনা।

হে আমার আনন্দময় কোষের অধিষ্ঠাতা, আমার মনোময় কোষকে মধুময় কর।

আনন্দ।

আজ মুক্ত আকাশের তলে, এই বাগানে বসে মনে হচ্ছে, এ জগতে সকল স্বতন্ত্র বস্তুই আনন্দাত্মক; কেবল আনন্দ দান করিবার জন্য ও দানে আনন্দ পাবার জন্যই, তাদের আবির্ভাব।

ঐ যে আকাশে তারা উঠ্‌ছে, অগম্য অচিন্ত্য হয়েও, "ক্ষুদ্র হয়ে আসে মোর সীমাবদ্ধ জ্ঞানে," ওপার হ'তে এপারে আমায় রহস্যের ক্ষীণ আলোক বার্ত্তা আন্‌ছে, প্রত্যেকটিই যেন নিজের ইচ্ছায় উঠ্‌ছে; প্রত্যেকরই একটি বিশেষ উজ্জ্বলতা ও আকাশের কোলে বিশেষ স্থান আছে, যাহা অধিকার করতে, রাশিচক্র ভ্রমণ আবশ্যক হয়েছে, আর ঐ অধিকারেই তারা বলে,

পরিচিত হচ্ছে, শূন্য অজ্ঞেয় আকাশকে রহস্য-ময় করে তুল্‌ছে, ও আমায় সেই রহস্যে আনন্দ দান কর্‌ছে। ঐ তারকার যদি স্বতন্ত্রতা থাকে, তবে সেও নিশ্চয় একদিন তারকা পথের শেষে, কোন আনন্দময় রহস্যের সাক্ষাৎ দর্শন পাবে।

ঐ যে সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছে, কেও জানে না, কোথায় এই স্রোতের উৎপত্তি, কোথায় স্রোতের গতি। জানিনা, কোথায় কোন্ কেন্দ্রে, শূন্য আকাশে অদৃষ্ট চক্রের ন্যায় কতকাল মহাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হচ্ছে। হে মহা-শক্তি, তুমি যেমন ধূলিকণাকে ধারণ কর্‌ছ, তুমি এই ক্ষুদ্র অঙ্গের ক্লান্তি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ। ক্ষুদ্রকে, যে বিরাম, যে আনন্দ দিচ্ছ, হে আবর্ত্তি। তুমি সে বিরামে, সে আনন্দে বঞ্চিত ?

বাগানের কোণে, ঐ যে তরু লতাটি উঠেছে, উহার সৃষ্টি কে করিল? কেও করেছে, কিন্তু ওটিকে লতা হ'তে গিয়ে, এই শুষ্ক কঠিন পাথুরে মাটির ভিতর দিয়ে গজিয়ে উঠ্‌তে হয়েছে, আর বাগানের কোণে বিশেষ স্থান অধিকার কর্‌তে হয়েছে। পরে পুষ্পিতা হয়ে, বাগানে শোভা ও আমায় সেই শোভায় আনন্দ দান কর্‌ছে। তাই বলি, তরু লতা, তোমার এই যে স্বতন্ত্রতা, তাহা দান করে শোভানন্দ দিলে। তুমি ও একদিন আনন্দামৃত পাবে।

আবার, ঐ যে মায়ের কোলে, শিশু নাচিতেছে। শিশু যে শক্তিতে, দশ মাস ধরে আঁধারে বর্দ্ধিত হ'য়ে, ধরণী পরে প্রসূত হ'ল, সে জৈবশক্তি কি স্বতন্ত্র নয়, নিজের প্রয়াসে নিজের অবসর খুঁজে নাই? যে জৈবশক্তি,

দৈবশক্তির ন্যায়, শিশুর ভিতর দিয়া, মর্ত্তে্য প্রেম ও করুণা আনয়ন কর্‌লে, ও অনন্দের, প্রাণানন্দের, নৃত্যকারী প্রতিরূপ গঠন কর্‌লে, সে আনন্দাত্মক নহে?

আবার, ঐ অগাধ সমুদ্র বক্ষে, তরঙ্গ লীলা। হে তরঙ্গ, লীলা-ফেন সমুদ্র বক্ষে তোমার উৎপত্তি বলে, সমুদ্র-গরিমা মনে এনো না। ক্ষণিক তোমার আকৃতি, ক্ষণিক তোমার লীলা। কিন্তু হে ক্ষণজন্মা, হে সাগর শিশু, সাগর সখা, তোমারই লীলাতে যে তুমি চিরন্তন অগাধ সমুদ্রকেও নূতনত্ব দান কর্‌লে ও নূতন আনন্দের আধান কর্‌লে। হে তরঙ্গ, সমুদ্র হ'তে তোমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়? সে তোমার তুমি আনন্দে।

আবার ঐ যে মাটির গর্ভে, আগ্নেয়গিরির

বীজ, কে নিহিত করলে ? কোন শক্তিতে, একদিন এই বীজ হতে, জ্বলন্ত অঙ্গার নির্গমে, ক্ষীরোদধিতে মহালক্ষ্মীর ন্যায়, এক ধ্বংস জনিত অপূর্ব্ব সৃষ্টির আকস্মিক উদয় হইল ? সেই রুদ্র সৃষ্টিতেও আনন্দ রস, রুদ্রানন্দ, ভৈরবানন্দ, তবে সেও আনন্দাত্মক।

মন, তুমি কি কখনও কাহাকেও আনন্দ দান করেছ ? করেছ কিনা, সে কথা তুমি জান না, জান্‌তেও পার না। তবে তুমি জান যে, তুমি আনন্দ পেয়েছ। সেইরূপ ঐ আকাশের তারা, শূন্যের বায়ু, বাগানের কোণে লতা, মাতৃক্রোড়ে শিশু, অগাধ সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গ রাশি, ধরণী গর্ভে আগ্নেয়গিরির বীজ, এরাও জ্ঞানে দান করেনি। তবে এরা যে দান করেছে, সে কথা, তুমি জান। তুমি তাহার ভোগে আনন্দ পেয়েছ। দেওয়া

পাওয়া কিন্তু এক জিনিষেরই দুটা দিক। তোমার পাওয়া সম্বন্ধে যে আনন্দ, এদের দেওয়া সম্বন্ধেও সেই আনন্দ। দেওয়া মানে নিজের স্বত্ব দেওয়া, পাওয়া মানে নিজের স্বত্ব পাওয়া। সুতরাং যে আনন্দ দেয় ও যে আনন্দ পায়, উভয়েই আনন্দাত্মক।

মন, এও জেন, যেমন এদের আনন্দ দানের কথা তুমি জেনেছ, তেমনি তোমার আনন্দ দানের কথা, তুমি না জানিলেও, আর কেহ জেনেছে। তুমি যেমন এদের দ্বারা আনন্দ পেয়েছ, সেইরূপ আর কেহ, তোমার দ্বারা আনন্দ পেয়েছে। আবার তার দ্বারা, আর কেহ। এ যে অনন্ত আনন্দ ধারা, এর শেষ কোথায়? এর আদি কোথায়? এই ভাণ্ডার পূর্ণ করা, আবার দানে

নিঃশেষ করা, আবার পূরণ, আবার বিতরণ, এ জগতে পূর্ণিমা ও অমানিশার চাঁদের ন্যায়, চলতে থাক্‌বে। এই "তুমি" আর "আমি" চিরকালই থাকবো, একজন দেবে, একজন ভোগ কর্‌বে। ইহাই চিরন্তন প্রথা।

সর্ব্বাগ্রে দিয়েছিল কে? আর সেই আনন্দ দাতার ভাণ্ডারে কে আনন্দ আনলে? কবে সেই ভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়েছিল? কে কাকে প্রথম আনন্দ দান করেছিল? আমাদের মধ্যে কেও? সে কে?

প্রকৃতির প্রতি—১।

হে আমার ধরণি, হে আমার বিশ্ব, হে প্রকৃতি, তোমার দান শেষ হয়েছে। তুমি বসন্ত প্রেরণ করেছিলে, আমি তাকে দিয়ে নিজের মনে, নিজের বসন্ত, সৃষ্টি করেছি। তুমি আজ তোমার বসন্তকে নিয়ে ফিরে যাও। আমাকে ছেড়ে চলে যাও। তোমাকে আমি কিছু দেব না। তোমার তারকার বার্ত্তা, তোমার বায়ু-প্রবাহ, তোমার তরুলতা, তোমার শিশু, তোমার তরঙ্গ ভঙ্গ লীলা, তোমার আগ্নেয়গিরিশ্রেণী, এরা সবাই আমাকে কিছু দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমায় কিছু দেবো না। তবে আমি কাকে দেবো? সেই যে বসন্তের সৃষ্টি করেছি তাকে। তুমি আর তাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

সে যে আমার সৃষ্টি, আমি শুধু তাকে দেবো।

হে আমার বিশ্ব, তুমি ত কিছু জ্ঞানে দাও নাই, তবে তোমার জ্ঞানের দান গ্রহণ কর্‌বার ক্ষমতাও নাই। জ্ঞানই জ্ঞানের দান বুঝ্‌তে পারে। অংশই কেবল পূর্ণ হবার স্বাদ পায়। পূর্ণও অংশকে নিজের মধ্যে রাখতে চায়। তাই বলি, প্রকৃতি, তুমিত কেহ নও। তুমি আমার কেহ নও, তুমি কেবল আমার কর্ম্মদাস। তুমি না চাইলেও, আমি তোমাকে কর্ম্মদাস করে নেবো। এ আমার মহাশক্তি। এর হাত হতে, তোমার এড়াবার সাধ্য নাই। তোমাকে, তোমার কর্ম্ম, তোমার সেবা, আজ আমি চাই না, কিন্তু আবার চাহিব। আমার আত্মশক্তির প্রভাবে,তোমার কর্ম্ম শেষ হবে না। তোমাকে

চিরকাল চেতনের কর্ম্মদাস হয়ে থাকতে হবে। যখন আমার ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসবে, তখন তোমার সত্তায় নেমে, আমি আবার ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিয়ে আস্‌বো। আর আমার বসন্ত রাজাকে দান কর্‌বো। আমার সৃষ্টিকে পালন কর্‌বো। আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করবো। তুমি, না, বল্‌তে পারবে না। এ শক্তি তোমার নাই।

আমি কেবল আমার রাজ সম্পদকে বৃদ্ধি কর্‌বো, আমার জ্ঞানকে অসীমের দিকে নিয়ে যাব। যতদিন না আমার জ্ঞানের অ-কালে পর্য্যবসান হয়, ততদিন, হে বিশ্ব, তুমি কেবল কর্ম্মদাস হয়ে কর্ম্ম কর।

প্রকৃতির প্রতি—২।

হে প্রকৃতি! তুমি কেন বারবার তোমার বসন্তকে আমার নিকট প্রেরণ কর? তুমি কেন আমার কর্ম্মদাস হ'য়ে কর্ম্ম কর? আমি তোমায় কিছু দেবো না, তবু তুমি আস, নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিয়ে আস; এসে, বিতরণ করে ফিরে চলে যাও।

তুমি চির পুরাতন, তবে তোমার নব বধূর ন্যায় নূতন আভরণ কেন? কেন নিত্য নূতন আভরণে তুমি আমার কাছে দেখা দাও? কেন পুনরায় তোমার ভাণ্ডারে অবতরণ করি, আমি তোমার ভাণ্ডারে নেমে সব লুট করি, আর তুমি নীরব হয়ে থাক? তুমি কেন বাধা দাও না? তোমার কি শক্তি নাই? তুমি আমায় দান কর, কিন্তু তোমার

জ্ঞান নাই। তুমি দুর্ব্বল। তুমি জ্ঞানে দান করিতে জান না, তাই কি অজ্ঞানে তোমার ভাণ্ডার খুলে দিয়েছ? আমি আমার আত্ম-শক্তি বলে সব গ্রহণ কর্‌ছি, আর তোমাকে জ্ঞানহারা ও শক্তিহারা বলে, কর্ম্মদাস করেছি।

হে প্রকৃতি, তোমার 'তুমি-জ্ঞান' কি কখনও ছিল? আজ বুঝি তোমার তুমি-জ্ঞানের কথা বিস্মৃত হয়েছ? আজ কি তাতে বিশ্রান্ত হয়েছ? তাই অকাতরে দান করিতেছ, তাই আর কিছু চাও না। শুধু বিতরণ করাই তোমার কর্ম্ম। তাতেই তোমার তৃপ্তি। সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তিতেই তুমি ক্ষান্ত হ'য়ে আছ।

মন, তাই যদি হয়, তবে কি অজ্ঞানের দান জ্ঞানের দান অপেক্ষা বড় নয়?

আমিত জ্ঞানে এই শান্তি অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু জ্ঞান যে এক অবিরাম স্রোত, তাহাকে স্থির ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কৈ? সে যে কেবলই জোয়ার ভাঁটা, কেবলই হ্রাস বৃদ্ধি, কেবলই জন্ম মৃত্যু। প্রকৃতির চাঁদ, প্রকৃতির বসন্ত, আসে যায়, যায় আবার আসে। যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প, ঘুরে ফিরে আসে। এখানে নূতন ও পুরাতন, পুরাতন ও নূতন। ইহাই চিরন্তনের লীলা। তাই এ রাজ্যে জরা নাই, অবসাদ নাই, অশান্তি নাই। জ্ঞানে ইহার বিপরীত। সেখানে যৌবন জরাগ্রস্ত, জন্ম মরণময়। ঢেউ এর পর ঢেউ, বীচির পর বীচি, তীরে বসিয়া গণনা করিতেছি, যাহা যায়, তাহা আর আসে না। এই নূতনে নূতনে, আর আমার প্রীতি নাই। এ যে

ভবের ঘোর। এ ঘোর আমার কাটিয়াছে। শান্তি কোথা পাই? জ্ঞানে প্রকৃতির ধৈর্য্য কোথায়? প্রকৃতির বিরাম কোথায়? প্রকৃতির চিরন্তনত্ব কোথায়?

হে প্রকৃতি, জ্ঞানে রস-সামগ্রীর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু এ জ্ঞান যে নিত্য অখণ্ড সত্তার রসে বঞ্চিত। এ যে সেই একরসকে মধুর-তিক্তে, অম্ল-লবণ-কষায়ে পরিণত করে। জ্ঞানে যাহা ভোগ করি তাহাতেই যে অরুচি আসে, অস্পৃহা আসে, বিরাগ আসে। হে প্রকৃতি তুমি সর্ব্বভুক্। তোমার কিছুতেই অরুচি নাই, বৈরাগ্য নাই, অবসাদ নাই। তোমার ধৃতির, তোমার ক্ষান্তির, তোমার বিস্মৃতির সন্ধান আমায় বলিয়া দাও। কোন একরসে ডুবিয়া তুমি আজ তুষ্ণী হয়ে আছ?

জ্ঞান আমায় রাজ সম্পদ দিয়েছে, কিন্তু এ যে শূন্যের উপর আধিপত্য। এই জ্ঞানের চোখ যেখানে পড়ে, সে সবই অলীক হয়ে যায়, ভূয়ো হয়ে যায়, আর সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া শূন্য ধূ ধূ করতে থাকে। এই ছায়ার রাজ্যে ছায়া-রাজা, এই কি জ্ঞানের স্বারাজ্য! হে প্রকৃতি, আমাকে তোমার সত্তায়, তোমার সত্যে পূর্ণ কর।

হে প্রকৃতি, তোমার অজ্ঞানেই যে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমার এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানে, আমার এই 'আমি-জ্ঞানে', তোমার এই অজ্ঞানের মহিমা বুঝিতে যে আমি অসমর্থ। আমি আমার জ্ঞানের বার্ত্তা বিস্মৃত হয়ে, তোমাকে তোমার অজ্ঞানে, পাইতে চাই। তোমাকে, জ্ঞান দান করিতে আমার সাধ নাই। তোমাকে অসীম থেকে,

আর আমার মধ্যে, আমার অজ্ঞানের মধ্যে আন্‌তে চাই না। তুমি অসীমের ভক্ত, রূপ-বিহীন। আমি তোমায় অসীমের মধ্যেই রাখ্‌বো। তোমার অনন্ত রূপ অরূপের মধ্যেই দেখ্‌বো।

হে প্রকৃতি! আজ আর আমি জ্ঞান পথে জন্ম মৃত্যুর ঘোরে, ঘুরিতে চাই না। আজ আমি জ্ঞান হারা হইতে চাই। তোমার বসন্ত যে জ্ঞান হারা।

নাহি আজ কর্ম্ম তার, নাহিক মুরতি,
নাহি জ্ঞান, নাহি ধ্যান, সীমার অতীত;
মন্ত্র মুগ্ধ প্রকৃতিরে করে তার সাথী
বিশ্ব-মহা-কাল-চক্রে হতেছে ঘূর্ণিত।

প্রকৃতি, তুমিই আমায় মুক্তি দাও। আমাকে রূপের বহির্ভূত কর। আমার মৃত্যু হউক। আজ আমি অরূপের, অজ্ঞানের,

ভক্ত। আমাকে জ্ঞান হারা করে তোমার কর। আজ আমি তোমার হতে চাই। এই সাধ আমার পূর্ণ কর।

(বঁধু—১।)

প্রেমে ভিক্ষা।

মন আমার, তুমি আর কি চাও? এখন ত আর মূর্ত্তির অভাবে, আধারের অভাবে, সৃষ্টির অভাবে, তোমার অভাব বোধ নাই। আজ যদি তোমার কেও না থাকে, যাদের আধার বলে প্রতিগ্রহ করেছিলে, তারা যদি সব শূন্য হ'য়ে যায়, তুমি কিছুর অভাব বোধ কর্‌বে কি?

না, তাদের আর চাই না। সৃষ্টি আর চাই না।

তবে আমি আর কি চাই? প্রকৃতি ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিলাম। সময় ত আমার সাক্ষী জ্ঞানে

স্থির হয়ে গেছে, তাকে কারাগারে বদ্ধ করে রেখেছি। আজ আমি একরাট্। তবে আমার আর কি চাই ?

না, আজ আমি ভিখারী। বঁধু, আজ আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি। আমারই প্রেমে, তোমায় জীবন দিয়াছিলাম, তোমায় মূর্ত্তি দিয়াছিলাম। সে মূর্ত্তি সবাই দেখেছিল। আজ তোমার মূর্ত্তি আর কেহ দেখে না। তবে এসো বঁধু, আজ আমার এই অন্তঃপুরে, এই গুপ্ত আগারে তোমায় সংহার করবার আগে আমি একা তোমায়, প্রাণ ভরে দেখি। এসো বঁধু, রহসি তোমার সেই রস পান করি, যাহা সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে, আমার জন্যই, চিরামৃতের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। হে আমার চাঁদ, আকাশে সবাই তোমায় দেখেছে, কিন্তু

তোমার সেই রূপ, সেই দিক, পৃথিবী কখনও যাহার সন্ধান পায় নাই, বুঝি বা স্বয়ং ভগবান সূর্য্যও, তোমার যে ষোল কলায় পূর্ণ রূপ, সাক্ষাৎ দেখে নাই, আজ হে আমার অসূর্য্যম্পশ্য বঁধু, তোমার সেই অপরূপ রহস্য এই শেষ মুহুর্ত্তে, আমার নিকট প্রকাশিত হউক। এস বঁধু, শেষ বার এসো। কাছে আরও কাছে, আরো আরো কাছে। আমার আশা যে মিট্‌ছে না। তুমি অন্তরে। তুমি যে এখনও দূরে। একি, তোমায় কেমন করে পাব? তুমিই যে, তোমার অন্তরায়। তোমাকে সংহার না কর্‌লে এ অনন্ত আকাঙ্খার তৃপ্তি কোথায়? মিলন কোথায়?

তুমি আসতে পারছ না? কিছু চাও কি? তোমার চাওয়া শেষ হয় নাই বলে, কি তুমি আসতে পার্‌ছ না? হে তৃষ্ণাতুর,

তোমায় চিরনিদ্রা দেবার আগে আমি তোমার সকল তৃষ্ণা মিটাইব। কি চাও বল। আমার ভাণ্ডারে সব আছে। আমি যে রাজভিখারী, স্বারাজ্যের পর আমার এই ভিক্ষাচর্য্য। তুমি আমার বঁধু, আমার প্রিয়-তম, তোমাকে দেবো না? আমার কাছে তোমার কি আদর, তাত তুমি জান না। নিজের মূল্য জান না। তাই চুপ করে আছ, কিছু চাচ্ছ না। তুমি না চাহিলে যে আমি তোমাকে পাই না। আমি স্বাধীন, আমার স্বারাজ্য হয়েছে। কিন্তু নিয়তির এই শেষ শৃঙ্খল আমাকে বেঁধে রেখেছে। আমি আমার বৈকুণ্ঠে, প্রিয়তমের অপেক্ষায় বসে আছি। হে অজ্ঞান, হে পাষাণ, এমন করে কি অনন্তকাল তোমার জাগরণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব? তোমার কি মোহ-নিদ্রা

কাটিবে না? হে আমার অজ্ঞান-কবলিত তুমি তোমার যোগ-নিদ্রা হইতে উত্থিত হও।

তবে এস বঁধু, এস, বৈকুণ্ঠে আমার দক্ষিণে তোমার সিংহাসন যে শূন্য রয়েছে। এসো বঁধু, এসো, আমার সমান হয়ে এস, আমার মতন হয়ে এস। তুমি তা হ'তে পারবে না? অবশ্য পারবে। তা যদি না হয়, তবে ত অনন্ত বিরহ, অনন্ত দুঃখ। তুমি যদি আমার সমান না হও, তাহলে ত তুমি আমার বঁধু হয়ে থাক্‌বে। তাত আমি চাই না। আমি ও আমার বঁধু দুই হ'য়ে থাক্‌ব তাত আমি চাই না। আমি যে তোমার এই বাঁধ ভাঙ্গিতে চাই। এই সীমার লোপ চাই। হে আমার সীমা-আবদ্ধ, তোমার বন্ধন মুক্ত হউক।

(বঁধু—২।)

মিলন যোগ ও যোগ ভঙ্গ।

পরিণয়ে মৃত্যু! প্রজাপতির আদি অভিশাপ! জন্মে জন্মে, বসন্ত সখার সহিত কাল-পরিণয়ের অভিনয় করিলাম। আজ আমি ও বঁধুর মিলনে, সেই যুগ যুগান্তরের অভিনয় সমাপ্ত হবে। আহা! কি মধুর মৃত্যু! কি করুণ সংহার!

আজ আমাদের মিলন, আজ আমাদের লয়। এ বিশ্বে আজ আর আমিও থাক্‌বো না, আমার বঁধুও থাক্‌বে না। আজ হ'তে আমারও লোপ হবে, আমার বঁধুরও লোপ হবে। আমার বঁধুকে কেবল আমি জানিতাম, আর কেহ জানিত না। হায়! তার অভাব কেও বুঝবে না। তবে আমাকে

আমার এই রূপ, এই লীলা, আর তোমরা দেখবেনা। এমন 'আমি' যে আর হবে না। সবই থাকবে, অনন্তকাল ধরে সবই চলবে। কেবল এই 'আমি' চির-অস্তগত হবে। আর উদয় হবে না! বসন্তের আগমনে, যে লীলার আরম্ভ হয়েছিল, আজ সে লীলার অবসান হল। আমার সেই লীলার সহচর বসন্তকে তোমাদের কাছে চিরদিনের তরে রাখিয়া গেলাম। সে এখন তোমাদের সহচর। তোমরা তাহার অভ্যর্থনা করিও, কদাচ অনাদর করিও না। বসন্তের দান মাথা পেতে নিও। তোমাদের সেই প্রিয়তম তোমাদের মনোরথ পূরণ করুক। ওঁ স্বাহা ওঁ স্বস্তি। * * *

এই আমি বঁধুর মিলন যে এক যোগ। লয় যোগ। যেমন চিত্রকর যখন ছবি আঁকে

সে জানে না সে কি আঁকছে। তাহার •ছবির• মাহাত্ম্য সে বোঝে না। তবে যে দেখে, সে ছবির মাহাত্ম্য বোঝে, ছবির মূল্য নিজের মনে ঠিক করে, কিন্তু চিত্রকরের কাছে কিছু প্রকাশ করে না। চিত্রকর কেবল ছবি আঁকিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে তুলি খসিয়া পড়িল। শ্বাস প্রশ্বাস থামিয়া গেল, চক্ষের পলক আর পড়ে না, এই মিলনও সেইরূপ!

অথবা মার কোলে যেমন শিশু দুগ্ধ পান করে, শিশু কিন্তু কিছু জানে না! তবে মা, শিশুকে পান করাইয়া আনন্দ পান। এবং সেই আনন্দ, নিজে নীরবে ভোগ করেন। কারও কাছে কিছু বলেন না। অন্য কোন মাতাও, সেই মায়ের সেই আনন্দের কথা জানিতে পারেন না। সম্প্রতি

শিশুর অধর নড়ে না। পীযূষ ধারাও আর ক্ষরিত হয় না। মায়ের স্তন ত্রস্ত হইয়া পড়ে। মা ও শিশুর আদান প্রদান পর্য্য-বসিত হয়ে, পূর্ণ হয়। এই মিলনও সেইরূপ।

এই বঁধু ও আমার মিলন এক রস। বলতে গেলে, ইহাই আদি রস। এ যে রসের স্বরূপ, স্বরূপের রস। যুগল-বিগ্রহে যে রস মূর্ত্তি গড়ে উঠেছিল, এই একরসে গলিয়া গেল। বিগ্রহ চলিয়া গিয়া, যে নূতন সমগ্র আসিল, তাহাতে জ্ঞানের রস বিশ্লেষণ নাই। এ রস সাগরে, কেবলানন্দ, কৈবল্য রস, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত। * * * *

আমি ও বঁধূ দুই জনেই বড় শ্রান্ত হয়েছিলাম। এখন এই মিলনে শ্রান্তি, অশ্রান্তি, সমস্তেরই লয় হইয়াছে। এখানে বিরাম

ও বিরক্ত হয়েছে। স্তব্ধতাও স্তব্ধ হয়েছে। নীহারিকার রেখা যে শূন্য গর্ভে লীন হয়ে যায়, সে শূন্যও নাই। কিছুই নাই।

এ কি! এখানে কি বর্ত্তমান। কেহ না। কি একটা ছম্ ছম্ কর্‌ছে, চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌ছে। ও কিসের কম্পন—যেন হৃদ্‌কম্প, যেন দীর্ঘশ্বাস,—যেন কিসের হাহাকার। যেন কোন সুদূর তারকা মণ্ডল হ'তে কাদের হাহা-কার উঠ্‌ছে। কোন বিশ্ব মণ্ডল হতে ক্রন্দনের রোল উঠ্‌ছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে এ ক্রন্দন ধ্বনি কেন? যেখানে আনন্দ, সেখানে দুঃখের সৃষ্টি শোভনীয় নয়। এ মিলন শুদ্ধানন্দ। এ ক্রন্দন ধ্বনি তবে সেখানে কেন? এ মিলনের আনন্দ বিনাশ করিতে? এ মিলনকে আবার কর্ম্ম দিতে? এ মিলনের বাসনা জাগাবার নিমিত্ত। এ মিলনে যে

একটা অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঢাকা আছে। এ আনন্দও যে অপর-দুঃখের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহাও নিরানন্দ, ইহাও দুঃখ। সর্ব্ব মুক্তি না হলে ত মুক্তি নাই।

এই ক্রন্দন-ধ্বনিতে আবার দুঃখ জেগে উঠে। আবার বাসনা জন্মায়, বাসনা কর্ম্ম হয়ে জেগে উঠে। তবে কর্ম্মও একা হয় না। কর্ম্মে দুই এর আবশ্যক। ঐ দেখ আবার দুজনকে দেখ। আবার দুজনের সৃষ্টি হ'ল। বিশ্রাম শেষ হল, শ্রান্তি দূর হয়েছে। নিদ্রা শেষে দু'জনে উঠেছে। খেলার সাথীরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, চিন্‌তে পার্‌ছ ? এরা কারা ? এক প্রেমিক ও তাহার বঁধু। তুমি ও তোমার বঁধু। সে ও তাহার বঁধু। কে ও কার্‌ বঁধু ? কেও বল্‌তে পারে না। কেও জানে না। ঐ যে

দেখি, অনেক প্রেমিক অনেক বঁধু। একি, এই যে দেখিতেছিলাম দুই, আবার অনেক হয়ে পড়্লো। এর সংখ্যা নাই। এই কি বিশ্বের রাস-মণ্ডল? এই কি সৃষ্টির রাশি-চক্র?

সর্ব্বাগ্রে জেগেছিল কে? কার ক্রন্দন ধ্বনি কার কাণে লাগলো? কে ও কার সখা জাগলো? আবার দুজনের সৃষ্টি হলো? সেই উষালোকে কোন্ দ্বন্দ্ব প্রথমে সৃষ্টিপথে প্রয়াণ কর্‌লে? এদের কাহারও রূপ নাই। এরা কে? পুরুষ ও প্রকৃতি? আমি ও আমার বঁধু?

জানি না, কিছু জানিনো। যোগ ভঙ্গে সব ভুলে গেছি।